প্রসঙ্গ ॥ কাজুও আজুমা

প্রসঙ্গ ।। কাজুও আজুমা

অধ্যাপক কাজুও আজুমা সম্বর্ধনা স্মারক গ্রন্থ

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

(বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন)

১ বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২

ফোন ২৬৭১৩৮

PRASANGA KAZUO AZUMA
(a collection of essays on Professor Kazuo Azuma)

প্রথম প্রকাশ : ১৪ অগাস্ট ১৯৯৬

প্রকাশক
ধর্মপাল মহাথের
সাধারণ সম্পাদক
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

সম্পাদক
হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী

মুদ্রক
লেজো প্রিণ্ট
৭ ডা: অমল রায়চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০০০৯
দূরাভাষ : ০৩৩-৩৫০-৮৪০৮

প্রচ্ছদ
মৃণাল সাহা

মূল্য
৩০ টাকা

বিষয়সূচি

রবীন্দ্র অনুরাগী ভারতবন্ধু কাজুও আজুমা ❑ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
অধ্যাপক কাজুও আজুমা : এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ❑ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৮
শান্তিনিকেতনের নীড়ের পাখি আজুমা ❑ নিমাইসাধন বসু ১২
আশ্চর্য মানুষ ❑ পবিত্র সরকার ১৪
মানুষটি সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের ❑ দিলীপকুমার সিংহ ১৫
আজুমা দম্পতি—বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৬
কাজুও আজুমা : বাংলাচর্চার তিন দশক ❑ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ১৭
'মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে' ❑ রামবহাল তেওয়ারী ২০
কল্যাণমিত্র অধ্যাপক কাজুও আজুমা ❑ ধর্মপাল মহাথের ২৩
জাপান ও ভারতবর্ষ ❑ সুনতিকুমার পাঠক ২৭
কাজুও আজুমা : আবহমান জাপান-ভারত
সংস্কৃতির ধারক ❑ হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী ২৯
বর্তমান জাপানি সাহিত্য ❑ আশিস সান্যাল ৩৩
জাপানে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ❑ এম এইচ কবীর ৩৭
বর্তমান জাপানে রবীন্দ্রচর্চা ❑ কেহ্‌কো আজুমা ৪১
ক্রীড়াপ্রেমী কাজুও আজুমা ❑ অচিন্ত্য সাহা ৪৬
অর্ঘ ❑ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৪৮
মৈত্রীর আলেখ্য ❑ কল্যাণী কার্লেকর ৪৯
কলকাতার পত্র পত্রিকায় কাজুও আজুমা ❑ সংগ্রহ : উত্থানপদ বিজলী ৫১
'যেখানে সংকীর্ণতা সেখানে থাকতে পারবো না'
এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার ❑ তাপস অধিকারী ৫৪
জাপানে বাংলা সাহিত্য চর্চা ❑ কাজুও আজুমা ৬২
কাজুও আজুমার রচনা : কালানুক্রমিক তালিকা ৭১
শ্রদ্ধাবনত সম্মাননা ৭৮
অভিভাষণ ৮০

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

জাপানের বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক অধ্যাপক কাজুও আজুমার ৬৫তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই শুভ জন্মদিনে তাঁরই সমুজ্জ্বল উপস্থিতিতে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও এই গ্রন্থ প্রসঙ্গের প্রস্তাবনা। অধ্যাপক কাজুও আজুমা গবেষণা অনুবাদ ও লেখায় স্বনামধন্য। স্বল্প সময়ে এই পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন। যেসব গুণী ব্যক্তিত্বের সাথে অধ্যাপক আজুমার যোগাযোগ গড়ে উঠেছে তাঁদের সকলের সাথে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। যাঁদের সাথে পেরেছি তাঁরা সানন্দে তাঁদের মূল্যবান লেখা উপহার দিয়েছেন। বাংলা ভাষা চর্চা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান অনুবাদ ও গবেষণাধর্মী কাজে তাঁর অনন্য কীর্তি, সদালাপী, বিনয়ী এই মহান প্রতিভার প্রতি ভালবাসা-শ্রদ্ধা-আন্তরিকতার প্রকাশ সব লেখকেরই লেখায়।

অধ্যাপক কাজুও আজুমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা যাতে পাওয়া যায়, সে বিষয় সচেষ্ট হয়েছি। তাঁর কালানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জির তালিকা এখানে রয়েছে। গুণী ব্যক্তিদের কলমে অধ্যাপক আজুমার জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঘটনা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে। অধ্যাপক আজুমা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন অনেক অজানা তথ্য। তাঁর একটি রচনাও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী কেইকো আজুমারও একটি মূল্যবান লেখা এতে সংকলিত হয়েছে। সম্বর্ধনা গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশের জন্য কিছু ত্রুটি থাকলে সে দায়িত্ব সবিনয়ে গ্রহণ করছি।

আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে দ্রুত অবক্ষয় ঘটছে সেই প্রেক্ষিতে ভারতবন্ধু কাজুও আজুমার সম্বর্ধনার অমল আনন্দ আমাদের তমিস্রাচ্ছন্ন জীবনকে উজ্জ্বল করুক এই কামনা করি।

সম্পাদক

রবীন্দ্র-অনুরাগী ভারতবন্ধু কাজুও আজুমা

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত এবং জাপান দুটি দেশের নিবিড় সম্বন্ধ দীর্ঘ দিনের। বৌদ্ধধর্ম সেই সম্বন্ধের সেতু। এই ধর্ম সরাসরি ভারত থেকে যায় নি। চীন, কোরিয়া হয়ে উপস্থিত হয়েছে জাপানে। কিন্তু উপস্থিত হবার পর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধই গড়ে উঠেছে ভারতের সঙ্গে জাপানের। শুধু ধর্মের তত্ত্ব নয়, ভারতের বহু দেবদেবী উপস্থিত হয়েছেন জাপানে। তাঁদের রূপান্তরও ঘটেছে। বহু ভারতীয় শব্দ অঙ্গীভূত হয়েছে জাপানি ভাষায়। ধর্মীয় আচরণও সঙ্গী হয়েছে ধর্মভাবনার। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

পরবর্তী কালে অন্য দুটি সূত্র ধরে পরস্পরের কাছে এসেছে এই দুটি দেশ। একটি রাজনৈতিক, অন্যটি সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে কিংবা স্পষ্টতর ভাষায় বিপ্লবী আন্দোলনে জাপান ভারতের অন্যতম আশ্রয় হয়েছে। রাসবিহারী বসু এবং আরও পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্মরণীয় দুটি নাম এই প্রসঙ্গে। জাপান-ভারত মৈত্রীর তৃতীয় সূত্র রবীন্দ্রনাথ। নানা দেশে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী যাতায়াত। কিন্তু জাপানযাত্রা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণের ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। পর পর পাঁচবার জাপানে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বলাই বাহুল্য জাপানের মানুষ ও তাদের জীবনই রবীন্দ্রনাথকে বার বার টেনেছেন। প্রবল এই আকর্ষণের কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপানযাত্রী' নামে অসামান্য গ্রন্থে, যে গ্রন্থটি শুধু ভ্রমণবৃত্তান্ত মাত্র নয়, জাপানি জীবনের সারাৎসার রবীন্দ্র দৃষ্টিতে, সেইসঙ্গে ভারত-জাপান মৈত্রীসম্বন্ধের সেতু।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবশ্য জাপানের সম্বন্ধের সূত্রপাত এই ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে নয়। তার বহু পূর্বে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জাপানের প্রখ্যাত মনীষী ওকাকুরার আগমন ও বাসের মধ্যে দিয়ে। 'Asia is one' মন্ত্রের উদ্‌গাতা ওকাকুরা জোড়াসাঁকোয় এসেছেন। শুধু রবীন্দ্র পরিবার নয়, সেখানে মিলিত হয়েছেন সিস্টার নিবেদিতা এবং অন্যান্য অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি। এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ ঘটেছে মনীষী ওকাকুরার সংস্পর্শ ও প্রেরণায়। তিনিই নব্যভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পুরোধাপুরুষ। শিল্পী তাইকান এবং হিসিদাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণ এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পরে বিশ্বভারতীতে জাপানের নানা গুণীজনের আগমনে দুই দেশের সম্বন্ধ নিবিড়তর হতে থাকে। কবির আহ্বানে কত চারুশিল্পী, কারুশিল্পী, পণ্ডিত, ছাত্র গিয়েছেন জাপানে ও-দেশের অসামান্য সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাবার জন্য। কাম্পো আরাই এর মতো প্রখ্যাত চিত্রীও অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে এসেছেন শান্তিনিকেতনে।

যে-সব জাপানী মনীষী রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে ভারতে এসেছেন, অধ্যাপক কাজুও

আজুমাকে তাঁদেরই সার্থক উত্তরসূরী বলা যায়। বিশ্বভারতীতে জাপানি ভাষা অধ্যাপনার কাজে তাঁর প্রথম আগমন এবং শান্তিনিকেতন বাস। কিন্তু সে শুধু উপলক্ষমাত্র। গভীর অভিনিবেশে অধ্যাপক আজুমা শুধু বাংলাভাষা শিক্ষা ও আয়ত্ব করেই ক্ষান্ত হন নি। প্রবেশ করেছেন রবীন্দ্র সঙ্গীত ও চিন্তার জগতে। সেই সঙ্গে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ও ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে। বারংবার এসেছেন শান্তিনিকেতনে। ক্রমশঃ তাঁর দ্বিতীয় গৃহ হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন ও প্রাণের পরম আশ্রয়।

মূল বাংলা রচনা থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি রবীন্দ্রগ্রন্থের জাপানি তর্জমা করেছেন। তারপর জাপানের প্রখ্যাত এক প্রকাশন-সংস্থার উৎসাহে এবং বহু জাপানি গুণীজনের সমবেত প্রচেষ্টায় অধ্যাপক আজুমা রবীন্দ্র রচনাবলীর অনুবাদ ও প্রকাশে যুক্ত থেকেছেন। এ পর্যন্ত দুবার নির্বাচিত রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে জাপান থেকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, গান, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভাষণ সবই তার অন্তর্ভুক্ত। দুরূহ নানা রচনার সার্থক অনুবাদক হিসেবে অধ্যাপক আজুমার খ্যাতি আজ সুবিদিত।

কিন্তু অধ্যাপক আজুমার রবীন্দ্রচর্চা এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানে ইচিকাওয়া শহরে নাকাকোকুবুন পল্লীতে তাঁর দ্বিতল গৃহের একটি কক্ষ পূর্ণ করে তুলেছেন তিনি জাপানে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সংগৃহীত অজস্র তথ্যরাশিতে। যাবতীয় সংবাদপত্র কার্ত্তিকা, ধ্বনিমুদ্রিকা, পুস্তক, পুস্তিকা, প্রচারপত্র নিঃশেষে সংগ্রহ করেছেন তিনি। এই সঙ্গে আছে রবীন্দ্র সমকালীন, রবীন্দ্র-অন্তরঙ্গ নানাজনের সাক্ষাৎকারের বিবরণ। বিরাট গবেষণাকর্মের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ হয় এই বিপুল তথ্য আহরণে। যে মহাগ্রন্থ লিখিত হবে তা বলাই বাহুল্য, জাপান ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এক মহামূল্য আকরগ্রন্থ হয়ে থাকবে বিশ্বের রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুদের জন্য এবং এই গ্রন্থটিই চিরস্মরণীয় করে রাখবে রবীন্দ্র গবেষক হিসেবে অধ্যাপক কাজুও আজুমার নাম।

এছাড়া রবীন্দ্র-বিষয়ক বা রবীন্দ্র অনুষঙ্গ জড়িত গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তিনি। এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কাম্পো আরাইয়ের দিনপঞ্জি। প্রকাশক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বভারতী প্রকাশ করতে চলেছে তাঁর লেখা হোরি-সানের ডায়েরির বঙ্গানুবাদ।

এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত এক নিবিড় আনন্দ ও গভীর তৃপ্তির কথা বলি। 'রবীন্দ্র চিত্রকলা: রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা' নামে আমার একটি গ্রন্থের অন্যতম প্রধান অনুবাদক বন্ধুবর আজুমা। গ্রন্থটি জাপানি ভাষায় টোকিও থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। আমার আর একটি গ্রন্থ 'রবীন্দ্র সংগীতে অভিব্যক্ত রবীন্দ্র জীবন দর্শন' অনুবাদ করছেন তিনি। অচিরেই প্রকাশিত হবে জাপানে।

জাপানে রবীন্দ্রসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের ব্রত নিয়েছেন অধ্যাপক আজুমা। প্রতি বৎসর পঁচিশে বৈশাখ বহুসংখ্যক জাপানি নারী পুরুষ যে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করেন জাপানে তার নেপথ্যে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকে একথা সকলেরই জানা। সম্প্রতি রবীন্দ্রসাহিত্য ছাড়া ও রবীন্দ্র চিত্র কলা ও সংগীতের প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। এবং তাঁর সাফল্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ।

জাপানে অধ্যাপক আজুমার ঘরখানি বস্তুত ভারতীয় জ্ঞানী গুণীর অতিথিশালা। আজুমা দম্পতির আনুরাগ অতিথ্যের কথা আজ সুবিদিত।

কিন্তু অধ্যাপক গৃহিণী শ্রীমতি কেইকো আজুমার কথা না বললে অধ্যাপক আজুমার কথা সম্পূর্ণই হয় না। এই বিদুষী মহিলা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। স্নাতকোত্তর স্তরে এঁর গবেষণার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের বলাকা। সাহিত্য চর্চায়, বিশেষত রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চায় ইনি স্বামীর 'ছায়েবানুগতা'। অধ্যাপক নারার প্রিয় ছাত্রী শ্রীমতী আজুমা সাহিত্য চর্চা ছাড়াও গীত ও গীতবাদ্যের চর্চা করেন। এঁর কোতো (জাপনি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র) বাজনা অনেকেই শুনেছি। শুনেছি অসামান্য কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে রবীন্দ্র সংগীত ও জাপানি সংগীত। আর এঁর স্বহস্তের বাঙালি রান্নার স্বাদ যিনি একবার গ্রহণ করেছেন তিনি এঁকে কখনো ভুলবেন না। এই দম্পতি অনেক সময় ঘরে এই রান্নাই খান এবং কথা বলেন বাংলা ভাষায়। জাপানে এঁদের ঘরটিকে বঙ্গ সংস্কৃতি, রবীন্দ্র সংস্কৃতি চর্চার একটি নীড় বলা যেতে পারে। জাপানি রবীন্দ্র রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'গল্প সল্প' শ্রীমতী আজুমার অনুবাদ। জাপানে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে শ্রীমতী আজুমার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে প্রতিবৎসর। শান্তিনিকেতন তীর্থ ভ্রমণে ইনি প্রায়ই স্বামীর সঙ্গী। আশ্রমিক সমাজে বেশ বড়োই বলা চলে তাঁর পরিচয়ের গণ্ডী।

অধ্যাপক আজুমার আর একটি কীর্তিকে আজ বিশেষ ভাবে স্মরণ করবো। বিশ্বভারতীতে নিপ্পন ভবনের প্রতিষ্ঠা। গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল চীন ভবনের মতো বিশ্বভারতীতে প্রতিষ্ঠিত হোক নিপ্পন ভবন। সে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন এক তরুণ জাপানি ছাত্র শ্রী বিয়োদোর কাছে। সেই বিয়োদোসানের বয়স যখন আশি-ঊর্ধ্ব তখন আজুমাসানের উদ্যোগে প্রায় দু'শ জাপানি যাঁরা শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন অধ্যাপক এবং নানা বয়সী রবীন্দ্রঅনুরাগী, তাঁরা সবাই মিলে অর্থ সংগ্রহ করে নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। অবশেষে ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বহু বাঞ্ছিত উদ্বোধন হল শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীতে সংযোজিত হল একটি নবজাত ভবন। অধ্যাপক আজুমা জাপানের সেই নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠা সমিতির সাধারণ সম্পাদক, পরে বিশ্বভারতীর নিপ্পন ভবনের অন্যতম উপদেষ্টা।

অধ্যাপক আজুমা ভারত বন্ধু, ভারত-জাপান মৈত্রীর অন্যতম সেতু। শাশ্বত জাপানের যথার্থ প্রতিনিধি। তবে এ বোধ হয় তাঁর ব্যক্তিত্ব কিংবা ভূমিকার একটি দিক। অন্য একটি দিকও আছে। রবীন্দ্র অনুরাগী এই মানুষটি জাপানে আমাদেরই প্রতিনিধিত্ব করায় নিত্য ব্যাপৃত। জাপানে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির দৌত্য করে চলেছেন সানন্দে। তাঁর মধ্যে আশ্চর্যভাবে মিলেছে ভারতবর্ষ এবং জাপান।

আজ এই শুভদিনে বন্ধু আজুমাসানের দীর্ঘ, কর্মময়, আনন্দময় জীবন কামনা করি। প্রার্থনা করি, তাঁর সারস্বত সাধনা সার্থক হয়ে উঠুক, ঋদ্ধ করুক বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগৎকে।

অধ্যাপক কাজুও আজুমা : এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ভারত ও জাপানের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে চীনে, চীন থেকে কোরিয়ায় এবং কোরিয়া থেকে জাপানে গিয়ে প্রথমেই তার বিশ্বমৈত্রী ও ব্রহ্মবিহারের বাণী দিয়ে জাপানের মনকে জয় করে। জাপান ভারত-সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রবেশ করে মৈত্রীভাবনার রহস্যটিকে উন্মোচন করার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে এই মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ় করেন রবীন্দ্রনাথ। বৌদ্ধধর্মের উদার দৃষ্টি, সর্বভূতে সমত্ববোধ এবং উদাত্ত মৈত্রীভাবনা ও নি:সীম করুণা তাঁর চিত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। তারই ফলশ্রুতি বহু প্রবন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের অবদানের বিশ্লেষণ এবং জাতক অবলম্বনে বহু কবিতার নির্মাণ। কিছুটা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণে এবং কিছুটা সৌন্দর্যপিপাসা চরিতার্থ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাই বার বার জাপান পরিক্রমা করেছেন। জাপানের সৌন্দর্যবোধ ও কর্মোন্মাদনা দিয়ে ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আর মৈত্রীভাবনার শাশ্বত তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে জাপানকেও অনুপ্রাণিত করেছেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে জাপানও কবিগুরুর মধ্যে তার অন্বিষ্টকে খুঁজে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত কর্ম বিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে পূর্ণতা লাভ করেছে রবীন্দ্রভক্ত জাপানি-অধ্যাপক ড: কাজুও আজুমার কর্মকাণ্ডে। ভগবান বুদ্ধের ললিত বাণী যে মৈত্রীবন্ধনের সূচনা করেছে, যে বন্ধনকে দৃঢ় করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাকেই ভিত্তি করে বিরাট সৌধ রচনা করেছেন অধ্যাপক আজুমা। রবীন্দ্ররচনার জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে জাপানকে রবীন্দ্র-মানসে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের দিনপঞ্জী উদ্ধার করে বিস্ময়াবিষ্ট জাপানি তরুণ-তরুণীর চোখে রবীন্দ্রনাথ কি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র ছিলেন তা উত্তরকালকে জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অবদানেরও আলোচনা করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, কেমন করে, জাপানি চিত্রকলার সঙ্গে মিলনের ফলে বঙ্গভূমিতে শিল্পকলার নবজাগরণের সূচনা হয়। তাই বলতেই হয়, আজুমার সাহিত্যকৃতি যেন একটি বর্ণাঢ্য পিরামিড !

আজুমা-সেনসেইর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় সাতের দশকে। তখন আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। তবে এ দিনটার কথা আমরা মনে রাখি না। কারণ আমাদের মনে হয়, অনাদি অনন্তকাল থেকেই যেন আমরা একসঙ্গে আছি। একই সংস্কৃতি একই স্বপ্ন। আজুমা-সেনসেই জন্মসূত্রে জাপানি হলেও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সূত্রে পুরো ভারতীয় ! আর হৃদয়বৃত্তির কোমলতায় ও সৌন্দর্যরসপিপাসায় রবীন্দ্র-শিষ্য হবার সূত্রেই পুরো বাঙালি।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিশুদ্ধ ধারায় অবগাহন করে অধ্যাপক আজুমা বুঝেছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির বিরাট সৌধে প্রবেশ করার জন্য যেমন প্রয়োজন উপনিষদে প্রবেশ এবং বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীভাবনার সঙ্গে পরিচয় ও আর্যঋষিদের সঙ্কীর্ণ অহংতাবোধ পরিহারের উদাত্ত আহ্বানের ধারণার, তেমনি প্রয়োজন রবীন্দ্র চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়। কারণ মানবসভ্যতার ঊষালগ্নে উপনিষদে যে চিন্তাজালের অঙ্কুরোদ্গম, রবীন্দ্রচেতনায় তারই পরিণতি। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির বিশাল সৌধের প্রতিটি প্রকোষ্ঠেই তাঁর স্বচ্ছন্দ পদ-সঞ্চার। এইজন্যই বোধ করি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আজুমা-সেনসেইকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করে নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছেন, তেমনি দিল্লী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সাম্মানিক বাচস্পতি (ডি.লিট.) উপাধি প্রদান করে কৃতার্থ হয়েছেন।

আজুমা-সেনসেইর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আদর্শনিষ্ঠা ত্রুটিহীন পরিকল্পনা-রচনা ও তার বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সময়ানুবর্তিতা। কি সাহিত্যসৃষ্টি, কি বিনোদন, কি অধ্যয়ন, কি ভ্রমণ, তিনি যাই কিছু করুন না কেন, প্রথমে তার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করে নেন এবং পরে নিষ্ঠার সঙ্গে সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করেন। যাতে কোথাও কোন ত্রুটি না থাকে। সব কিছুই নিটোল সৃষ্টি হয়ে শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে। তাঁর সাহিত্যকৃতি যেমন শিল্প, ভ্রমণ এবং বিনোদনও তেমনি শিল্প। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। সব কিছুই সৌন্দর্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান।

এই পরিকল্পা-প্রণয়নের সার্থকতা ও অদম্য অধ্যবসায়ের জন্যই অধ্যাপক আজুমার পক্ষে শান্তিনিকেতনে ভারত-জাপানের মৈত্রীসম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য নিপ্পন ভবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় শিষ্য সুসো বিয়োদোকে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে চীনা-ভবনের ধাঁচে নিপ্পন-ভবন গড়ে তুলতে। বিয়োদো যোগ্য সহকারীর অভাবে বহুদিন কবিগুরুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারেননি। পরে যখন অধ্যাপক আজুমাকে তিনি সহকারীরূপে পান, তখন কার্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। এ প্রকল্প নিয়ে আজুমা-সেনসেইকে আমি যে শ্রম দান করতে দেখেছি তা অনন্যসাধারণ। এককভাবে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, ভারত সরকারর ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন,অর্থ সংগ্রহ করেছেন,অধ্যাপক নির্বাচন করেছেন। এমনটি না করলে 'নিপ্পন-ভবন' আজও রূপ পেত না। ভারত-জাপানের মৈত্রীবন্ধনের উল্লেখযোগ্য সেতু নির্মাণের কার্য অসমাপ্তই থেকে যেত। তাঁকে এই প্রশংসনীয় কার্যে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উপাচার্য অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু ও উপাচার্য অধ্যাপক শিশির মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক আজুমা অনন্ত জিজ্ঞাসার অধিকারী। সব কিছুই তিনি জানতে চান। তা সে শাস্ত্রার্থই হোক, আর বাঙালির গৃহস্থালীর খুঁটিনাটিই হোক। আমার কাছে তিনি উপনিষদের অনেক বাণী নিয়ে এসেছেন। তাদের মর্মার্থ জেনেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার সঙ্গে

তুলনা করে দেখেছেন। রবীন্দ্রমানসের গভীরে প্রবেশ করার ফলে আজুমা-সেনসেই বুঝেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই উপনিষদের হর্ম্যরাজিতে প্রবেশ করতে হয়। এ উপলব্ধি গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় মননশীলতারই ফল। আবার আজুমা-সেনসেইকে দেখেছি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাগৃহে প্রখ্যাত পণ্ডিত ধর্মপাল মহাথেরার পার্শ্বে উপবেশন করে তাঁর তৃতীয় নেত্রনির্গত আলোকে অভিস্নাত হতে। এ যুগে বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে আমি দুজনকে অগ্রগণ্য বলে মনে করি। একজন সারনাথ মানিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি এস রিমপোচে ; অন্যজন ধর্মপাল মহাথেরা। আবার আজুমা-সেনসেইকে দেখেছি, বাঙালি রন্ধন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে। এই অশান্ত জ্ঞানপিপাসাই অধ্যাপক আজুমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

অধ্যাপক আজুমার স্বাতন্ত্র্য কিন্তু অন্যত্র। তা হচ্ছে নিঃসীম অতিথি-বাৎসল্যে এবং গভীর মানবতাবোধে। যত বারই আমাদের জাপান-যাত্রার সুযোগ হয়েছে ততবারই আজুমা-সেনসেইর আতিথ্যগ্রহণ করতে হয়েছে। আর সে আতিথ্য অনন্যসাধারণ। উপকরণের প্রাচুর্য তো আছেই। সঙ্গে আছে স্নেহপ্রাচুর্য। ভারতীয়দের অন্যতম আদর্শ হচ্ছে 'অতিথিদেবো ভব' (অর্থাৎ অতিথিকে দেবতাজ্ঞান করবে)। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এ নীতিবাক্য ভারতবর্ষে তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। জাপানে আজুমা-সেনসেইর বাড়ীতে কিন্তু, তা সগৌরবে বিরাজিত। আর সে বাড়ীও সাধারণ বাসস্থান নয়। সরস্বতীর মন্দির। ইচিকাওয়ার সেই বাড়ীতে বাংলা বই-এর বিপুল সমারোহ। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের ওপর যত বই প্রকাশিত হয়েছে তার সবই সেখানে স্থান পেয়েছে। সঙ্গে আছে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের অন্যান্য মূল গ্রন্থ। কোনো ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই আমি দেখিনি। এ বাড়ীতে আজুমা-সেনসেইর দুটি রূপ : একটি অধ্যয়ন-ব্যসনী জ্ঞানপিপাসু সন্ন্যাসীর, অন্যটি অতিথিবৎসল স্নেহশীল গৃহকর্তার। এ গৃহের সকলেই অতিথিসেবায় সমর্পিত প্রাণ। মনে হয়, ভারত-আত্মা ইচিকাওয়ার ঐ নিভৃত গৃহকোণেই যেন আশ্রয় নিয়েছে !

এ-প্রসঙ্গে কেইকো আজুমার কথা না বললে চলে না। ধর্মপত্নী কেইকো সমস্ত কাজেই আজুমা-সেনসেইর সহচরী। দুজনে মিলেই যেন একটি বৃত্তকে পূর্ণ করেছেন ! কেইকো আজুমা-সেনসেইর শ্রুতিলিখন নিচ্ছেন,স্বামীর কাছ থেকে সূত্র গ্রহণ করে তাকে বিস্তৃত করে ফেলছেন,বড় বড় অক্ষরে লিখে তাকে স্বামীর পাঠযোগ্য করছেন, আবার অতিথিদের ও অভ্যাগতের পরিচর্যাও করছেন। দম্পতির এমন পারস্পরিক সৌমনস্য ও নির্ভরশীলতা আমি দেখিনি। ঠিক সেই পুরাতন 'গৃহিণী সচিব: সখা মিথ: প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ'-এর মত।

আজুমা-সেনসেইকে দেখে আমার অনেক কথাই মনে হয় এবং বলতে ইচ্ছা হয় :

তোমাতে দেখি যে তথাগতে আমি
দেখি রবীন্দ্রনাথে ;

ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসে দেখি
আর্য ঋষির সাথে ;
তোমাতে দেখি যে বিবেকানন্দে
কর্মযোগীর বেশে ;
আসিলে রচিতে দৃঢ় সে বন্ধু
ভারতে-জাপান-দেশে।
'জাপান ভবন' তুলি দিল শির
শান্তির নিকেতনে ;
বিছাইয়া দিল আসন তোমার
বিদগ্ধ-মন-বনে।
নিমাই তাইতো সাজাল অর্ঘ,
সোমেন পূজার ডালি ;
জাপানে-ভারত মিলিয়া, বন্ধু,
দিল স্নেহসুধা ঢালি।

সত্যি, ভারত-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কাজুও আজুমা এক বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এঁর সম্বন্ধে লেখার সুযোগ দিয়ে জগজ্জ্যোতি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

১. *নিমাইসাধন বসু, প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী*

২. *সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিশ্বভারতী ও সঞ্চালক নিপ্পন ভবন (জাপান ভবন) — সম্পাদক*

শান্তিনিকেতনের নীড়ের পাখি আজুমা

নিমাইসাধন বসু

কাজুও আজুমার সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা আপাত দৃষ্টিতে যেমন সহজ আসলে কিন্তু তা নয়। যাঁরা বিশ্বভারতীর সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ, শান্তিনিকেতনে বহু বছর ধরে জাপানি ছাত্র-ছাত্রীদের ও অধ্যাপকদের আসা-যাওয়া বা জাপানে রবীন্দ্রচর্চার খবরাখবর রাখেন তাঁদের কাছে কাজুও আজুমার নামটি অপরিচিত নয়। সম্প্রতি জাপানে জনপ্রিয়তা এবং শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবন-এর প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে খবরাখবরের ফলে অধ্যাপক আজুমার নামটি একটু বেশি পরিচিত হয়েছে। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে। শুধুমাত্র রবীন্দ্র সাহিত্যচর্চা, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ও রচনা অনুবাদের জন্যেই নয়, শান্তিনিকেতন ও জাপান তথা ভারত এবং জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় করার কাজে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্যে এই সম্মান ও স্বীকৃতির উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন কাজুও আজুমা। একটি বিদেশী মানুষ যে এই ভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথকে সত্যিই জীবনের 'ধ্রুবতারা' রূপে গ্রহণ করতে পারেন, সারা জীবন উৎসর্গ করতে পারেন তা কাজুও আজুমাকে না দেখলে না জানলে বিশ্বাস হবে না। ছেলেবেলা থেকে আজুমা রবীন্দ্রঅনুরাগী। 'রবীন্দ্রভক্ত' কথাটি বোধহয় ওঁর ক্ষেত্রে আরো উপযুক্ত হবে। পাঁচ দশক, অর্থাৎ অর্ধশতাব্দী পরেও সেই ভক্তি, অনুরাগ ও পড়াশোনা-গবেষণা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রবিন্দু করে তাঁর আগ্রহ এবং আকর্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি, জীবনের ক্ষেত্রেও। অনেকেই, এ-দেশে ও জাপানে ওঁকে বাঙালি বলে মনে করেন। আজুমা জাপানের একাধিক খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন। কিন্তু ওঁর সবচেয়ে বেশি খ্যাতি পরিচিতি হল 'শান্তিনিকেতন'-এর আজুমা বলে। আমার বিশ্বাস আজুমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হত 'আপনি কোথায় স্থায়ীভাবে অধ্যাপনা করতে চান ? কোথায় জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে চান? তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতেন — শান্তিনিকেতনে, ভারতবর্ষ।

শুরুতেই বলেছি, আপাত দৃষ্টিতে সহজ হলেও আজুমার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ, রবীন্দ্র গবেষণা, জাপানে রবীন্দ্র-প্রচার, শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা ইত্যাদির কথা বলা বা লেখা কঠিন নয়। কেননা, এসব তথ্য লিপিবদ্ধ, স্বীকৃত। কিন্তু ওঁর অবদানের আরো দুটি দিক আছে। যাঁরা ওঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, জেনেছেন, শান্তিনিকেতন ও জাপানে ওঁর কর্ম-তৎপরতা লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা ছাড়া অন্যদের পক্ষে সেই আজুমাকে সঠিকভাবে চেনার অসুবিধা আছে। বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে সেই সুযোগ আমার হয়েছিল — শান্তিনিকেতনে ও জাপানে। শুধু রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন,

বিশ্বভারতী-জাপানের মধ্যে আত্মিক বন্ধন গড়ে তোলা, সুদৃঢ় করার চিন্তায় আত্ম-মগ্ন আজুমাকে দেখা এক দুর্লভ দৃশ্য। শান্তিনিকেতনে 'নিপ্পন ভবন' গড়ে তোলার স্বপ্ন আজুমার অনেকদিনের। কিন্তু নানা কারণে তা সফল হয়ে ওঠেনি। অন্য কেউ হলে অনেক আগেই সম্ভবত হাল ছেড়ে দিতেন। কিন্তু আজুমা মানুষটি দেখতে ছোট-খাটো। মিষ্টভাষী, বিনয়ী হলেও খুব জেদি। চলিত কথা 'এক বগ্গা' বলা চলে। যা ধরেন তা না করে ছাড়েন না। তাই 'নিপ্পন ভবন'এর স্বপ্ন তিনি সযত্নে পালন করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি টোকিওতে রবীন্দ্র উৎসব ও প্রদর্শনীতে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। ওই উৎসবের উদ্যোগ ও আয়োজনের পিছনেও আজুমার হাত ছিল। টোকিওতে থাকাকালেই আজুমা আমাকে বিশ্বভারতীতে 'নিপ্পন ভবন' গড়ে তোলার কথা আবার বলেন। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে যেভাবে তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনের নব্বই বছর বয়সী জাপানি ছাত্র থেকে শুরু করে বর্তমানে শান্তিনিকেতনের উনিশ বছরের জাপানি ছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে নিপ্পন ভবনের পরিকল্পনাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পরিণত করায় উদ্যোগী হন সে এক বিচিত্র ইতিহাস। আজ যে শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবন গড়ে উঠেছে একদিন তা 'চীনা ভবন'এর মতো মর্যাদা ও স্বীকৃতি পাবে বলে আমি আশা করি। সেই ইতিহাসে কাজুও আজুমার এক বিশেষ নাম থাকবে।

আজুমার আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা না বললে তাঁকে পুরোটা জানা যাবেনা। সেটি হল তাঁর উষ্ণ আতিথেয়তা। তবে এর জন্যে তাঁর আগে শ্রীমতী আজুমার কথা বলতে হয়। জাপানিরা তাঁদের সৌজন্য ও আতিথেয়তার জন্যে পরিচিত। প্রশংসিত। কিন্তু সাধারণত তাঁরা স্বগৃহে অতিথিদের থাকার জন্যে আমন্ত্রণ করেন না। এর অন্যতম কারণ হল গৃহে স্থানাভাব এবং জাপানি পরিবারের কিছু কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, রীতি-নীতি। বাইরের জগতের অনেকের পক্ষেই জাপানি জীবনের শিষ্টাচার রীতির সঙ্গে সহজে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়না। জাপানিরা এটা জানেন বলেই বাইরের কাউকে গৃহের অতিথিরূপে আমন্ত্রণ জানাতে সঙ্কোচ বোধ করেন। কিন্তু আজুমা ও তাঁর স্ত্রী (কেইকো আজুমা) টোকিওতে তাঁদের পরিচিত কোনো বাঙালি গেলেই নিজেদের বাড়িতে ধরে নিয়ে যান। 'ধরে' নিয়ে যান এই জন্যেই বললাম যে, তাঁদের আন্তরিকতা ও সস্নেহ দাবির জোর এতই বেশি যে তা উপেক্ষা করা অসম্ভব। আমার সেই সুযোগ হয়েছিল। যে যত্ন পেয়েছিলাম আন্তরিক প্রীতি-ভালবাসায় সিক্ত হয়েছিলাম তা কোনো দিন ভুলব না। অনুরূপ অভিজ্ঞতা যাঁদেরই হয়েছে তাঁরা সবাই একই কথা বলবেন।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ শান্তিনিকেতনে আসুন। বাসা বাঁধুন। শান্তিনিকেতনের নীড়ে যেসব বিদেশী পাখি এসেছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন আজুমা। কিন্তু এই পাখিটি সেই নীড় ছেড়ে আর যেতে পারেননি। এমন জায়গায় ধরা পড়েছেন যে, বার বার ফিরে আসেন সেই নীড়ে।

আশ্চর্য মানুষ

পবিত্র সরকার

অধ্যাপক কাজুও আজুমা এক আশ্চর্য মানুষ, তাঁকে যত দেখি ততই অবাক হই। জাপানি, জার্মান আর বাংলাভাষায় দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, আর রবীন্দ্রনাথের এমন অনুরাগী সারা পৃথিবীতে আর একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। জাপানে রবীন্দ্রনাথকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি কী না করে চলেছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলি বারো খণ্ডে জাপানি ভাষায় প্রকাশ করেছেন, নিজে রবীন্দ্রনাথের উপর উৎকৃষ্ট একটি বই লিখেছেন — আর নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন জাপান আর ভারতের, বিশেষত বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে এক গভীর বন্ধন গড়ে তোলার। তার জন্য এ বয়সে বছরে অন্তত দু-বার এদেশে চলে আসেন, এই ঘামে-গরমে কলকাতা আর শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে যান। শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবন মূলত তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হয়েছে।

এবার (মে-জুন ১৯৯৬এর ন-দিন) জাপানে গিয়ে তাঁর অক্লান্ত কাজের অল্পস্বল্প যে পরিচয় পেলাম তাতেই বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়েছি। এয়ারপোর্টে আমার দুই পেল্লায় ভারী সুটকেস আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শরীর বাঁকিয়ে দৌড়ে ওঠা-নামা শুধু নয়, জেলায়-জেলায় কাম্পু-রবীন্দ্র সমিতি গড়ে তোলা, তোকিয়োতে রবীন্দ্র-অনুরাগীদের চমৎকার একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেওয়া। এসব সাংঘাতিক কাজে লিপ্ত আছেন তিনি আর তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী কেইকো আজুমা।

এই অসামান্য দুটি মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশ দেরিতে হল, এই যা দুঃখ। তা হোক, আগামী যে-কটা বছর বরাদ্দ আছে, তাতে অগ্রজ আজুমা-সান আর দিদি কেইকো-সানের স্নেহে-সৌহার্দে বেশ খানিকটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা উপহার পাব এমন আশা রাখি।

'আজুমা' কথাটির অর্থ নাকি 'আমার স্ত্রী'। জাপানিরা নাকি এই পদবী শুনলেই মুচকি হাসে। কিন্তু আজুমা-সান আমাদের কাছে আদৌ হাসির মানুষ নন, তিনি ভালোবাসার মানুষ। কাজুও কেইকো দুজনেই। তাঁরা দুজনে আনন্দে নিষ্ঠায় উদ্যমে আরও আরও বহু বহু বছর আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের সমৃদ্ধ করুন, এই কামনা করি। আজুমা-সানের জন্মদিনে তাঁর প্রতি আমার বিনম্র প্রণাম।

মানুষটি সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের

দিলীপকুমার সিংহ

অধ্যাপক কাজুও আজুমার সঙ্গে পরিচয় বেশি দিনের নয়, সত্যি কথা বলতে কি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর প্রথম পরিচয়ে যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল তা হল তাঁর সাবলীল বাংলা বলা, সে ভাষা কখনও কথার ভাষা কখনও লেখার ভাষা। বিশ্বভারতীতে বহুদিন অধ্যাপনা এবং সম্পর্ক রাখার ফলে বাংলা ভাষাভাষী নন এমন ব্যক্তি যে বাংলা চালিয়ে নিতে পারবেন তা হতে পারে না। কাজুও আজুমার বাংলা বলার শৈলী সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ওঁর সঙ্গে মুলাকাত তো হয়েইছে কিছু বিষয় নিয়ে বিশেষ করে নিপ্পন ভবনের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কর্মসূচী নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। নিপ্পন ভবনের প্রধান উদ্যোগীদের মধ্যে উনি যে একেবারে প্রথম সারির লোক তা অনেকেরই জানা আছে। তার মধ্যে অনেকে হয়ত ভাবনাচিন্তা হারিয়ে ফেলেছেন, নিপ্পন ভবন সম্পর্কে খুব বেশি আগ্রহ দেখান না। অধ্যাপক আজুমা এদিক থেকেও একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তি। দ্বিতীয় দফায় কিভাবে নিপ্পন ভবনের উন্নতি করা যায় এবং অন্য মাত্রা দেওয়া যায় সে সম্পর্কে তিনি সর্বদা এবং সর্বথা সচেষ্ট।

জাপান যাবার প্রাক্‌কালে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে জেনেছিলাম যে উনি একজন বড় ধরনের অধ্যাপক। সম্প্রতি জাপান ভ্রমণ শেষ করে এসে মনে হল তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বাড়ীতে বই-এর সংগ্রহ দেখলে সত্যিই তাক্ মেরে যেতে হয়। নানা জাতের বই সে ইংরেজি হোক, জাপানি হোক, সংস্কৃত হোক, বাংলা হোক, হিন্দি হোক এমনকি উর্দূ এবং অন্যান্য পশ্চিমী ভাষা। স্রেফ বইয়ের সংখ্যা দেখলেই অভিভূত হয়ে যেতে হয়। তারপর আছে বইগুলির গুণগত উৎকর্ষ। জাপান ভ্রমণকালে এক মুহূর্তও বুঝতে দেননি যে আমরা বিদেশে আছি। হয় অধ্যাপক আজুমা বা ওঁর স্ত্রী বা ওঁদের নির্দেশমত অন্য কেউ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। শুধু মাত্র ভাষা বোধগম্য করার জন্য নয়। জাপানি ও ভারতীয়দের মধ্যে যোগসূত্র বৃদ্ধি করার জন্য তিনি ছিলেন উৎসাহী। জাপানে ওঁর বাড়ীতে বাইরের দরজায় কোন চাবি দেওয়া হয়না। তার কারণ সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বাস ও চোরেদের ওপর আস্থা যে তারা বই চুরি করবে না।

কাজুও আজুমা একজন বড় ধরনের বিদগ্ধ ব্যক্তি, যিনি সতর্ক, সজাগ এবং জাপানি কায়দায় ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করায় অভ্যস্ত সে যতই শক্ত হোক না কেন, মানুষটি সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের। শিশু সুলভ সারল্য অথচ বয়স্ক ব্যক্তির মত বুদ্ধি প্রখর। জাপান ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ গড়ে তোলার কাজে ওঁর দান অসামান্য। আমরা আশা করব যে এই বিশেষ দিন অর্থাৎ জন্মের দিন বার বার ফিরে আসবে এবং নিত্য নতুন ধারণা দিয়ে তা পুষ্ট হবে।

আজুমা দম্পতি—বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কাজুও আজুমা সান একজন বিস্ময়কর মানুষ। জাপানের এই জ্ঞান তাপসকে প্রখর গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতনের পথে দেখা যায়। আবার কখনো কলকাতায়, কখনো টোকিও শহরে। রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র জীবন দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা অনেকেই জানেন, এ ছাড়াও সমগ্র বাংলা সাহিত্য এবং বাংলার মানুষ বাংলার সমাজ জীবনের রীতিনীতি সম্পর্কেও তিনি বিশেষ আগ্রহী। সাইকেলে এবং পায়ে হেঁটে তিনি ঘুরেছেন বাংলার গ্রামে গ্রামে। এজন্য তিনি সযত্নে শিখেছেন বাংলা ভাষা। জাপানে রবীন্দ্র সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ এবং প্রসারের জন্য তিনি অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছেন।

তাঁর সঙ্গে আমার একাধিকবার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে শান্তিনিকেতন, কলকাতা এবং টোকিও শহরে। বিদ্যার প্রধান গুণ যে বিনয়, সেটা তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। এত বড় পণ্ডিত হয়েও তাঁর ব্যবহারে প্রাখর্য নেই, রয়েছে স্নিগ্ধতা। সেইসঙ্গে রসবোধ। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে সময় কেটে যায় তা বোঝাই যায় না। বয়েস তাঁকে কাবু করতে পারেনি, এক সময় তিনি চক্ষু পীড়ায় ভুগছিলেন, তবু তা অগ্রাহ্য করে হাস্য-পরিহাসে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছেন।

আজুমা সান-এর প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রীর কথা বলতেই হয়। এরকম দয়াবতী, গুণবতী মহিলা আমি আর দেখিনি। স্বামীর সঙ্গে তিনি, বহুবার এসেছেন এদেশে, এখানকার মানুষজনের সঙ্গে সমানভাবে মিশেছেন। টোকিও শহরে তিনি আমাদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বহু দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরেছেন অক্লান্ত ভাবে পায়ে হেঁটে, কত রকম যে যত্ন করেছেন, তাঁর আতিথেয়তার তুলনা নেই। আজুমা সান-এর তিনি সুযোগ্য সহধর্মিণী।

এই জাপানি দম্পতিকে আমি শুধু বাংলা-প্রেমিক বা ভারত-প্রেমিক বলতে চাই না। এঁরা প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-প্রেমিক এবং মানব-প্রেমিক।

কাজুও আজুমা : বাংলাচর্চার তিনদশক

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

জাপানের ইওকোহামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতে এসে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন ৩৫ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন জাপানি ব্যক্তিত্ব কাজুও আজুমা সান, ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে আমি অধ্যাপকরূপে কাজে যোগ দিয়েছি তার ঠিক এক বছর আগে, ১৯৬৬র জুলাইয়ে ; আমার ২৪ বছর বয়সে। ১৯৬৭র নভেম্বরেই আজুমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আলাপ অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করার অল্প দিনের মধ্যেই আমি এমন একজন সুহৃদ পেয়েছিলাম যিনি সময় নষ্ট করেন না, পরচর্চা করেন না, দুপুরে ঘুমোন না, যাঁর অভিধানে বিশ্রাম ও আলস্য শব্দ দুটি নেই, এবং যিনি প্রকৃতপক্ষে এক আদর্শ বিদ্যানুরাগী কৃতী সজ্জন পণ্ডিত মানুষ।

১৯৬৮তে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন জাপানের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা। প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই কাওয়াবাতা প্রথম, যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। এই সূত্রেই আজুমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

আমি ও আজুমা সেই সময় স্থির করি কাওয়াবাতার সাহিত্য কীর্তির উপর আমারা উভয়ে মিলিত প্রয়াসে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ তৈরি করব। কয়েক দিন জাপানি বিভাগের লাইব্রেরি থেকে বহু বই ঘেঁটে 'প্রাচ্য ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতা' শিরোনামে একটি লেখা আমরা তৈরি করি। কাজুও আজুমা ও আমার নামে সে-লেখা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সম্পাদকের হাতে রচনাটি জমা দেবার সাত দিনের মধ্যে, ১৯৬৮ সালের ২ নভেম্বর। বাংলা ভাষায় লেখা ও বঙ্গদেশে মুদ্রিত এটাই আজুমা সানের প্রথম প্রকাশিত রচনা। এই রচনাটির মাধ্যমেই 'কাজুও আজুমা' নামটির সঙ্গে দেশের মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে।

এই নিবন্ধ প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রদ্ধাস্পদ সাগরময় ঘোষ আমাদের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার একটি উপন্যাস অনুবাদ করে দেবার জন্য। শান্তিনিকেতনে আজুমার এনগুজ পল্লীর আবাসে চা খেতে খেতে সম্পাদক মাশই আমাদের বলেন, এমন একটি উপন্যাস চাই যা এখনো পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাতে অনুবাদ হয়নি।

কাওয়াবাতাকে আমরা চিঠি লিখলাম — আমরা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ থেকে আপনাকে চিঠি লিখছি। আমরা এখানে আপনার একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে চাই যেটি এখনও অন্য কোনো ভাষায় তর্জমা হয়নি। অনুগ্রহ করে আপনি

আমাদের জানান ও অনুমতি দিন।

তাঁরই নির্দেশ ও অনুমোদনক্রমে আমরা উভয়ে মিলে তাঁর 'নিজি' উপন্যাসটি বাংলায় তর্জমা করি। দেশ পত্রিকায় ১৯৬৯এর জুন থেকে সেটি 'ইন্দ্রধনু' নামে ধরাবাহিক প্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাসটি অনুবাদের কাজে আমাদের অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সকালে অধ্যাপনার শেষে আমরা দুপুরে তর্জমার কাজ নিয়ে বসতাম। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম মাথায় নিয়ে দিনের পর দিন উভয়ে বসে ধীরে ধীরে এই কাজ আমরা সাঙ্গ করেছি। ওই তিন-চারটি মাস এই যুগ্ম তর্জমাকারের সমস্ত চিন্তা ভাবনা মনোযোগ 'ইন্দ্রধনু'কে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। সেই গরমের দুপুরে শ্রীমতী আজুমার হাতের তৈরি লেবুর রসের ঠাণ্ডা সরবত অমৃত লাগতো।

১৯৭০-এ, ১৩৭৭-এর দেশ সাহিত্য সংখ্যায় আজুমা ও আমার যুগ্ম লেখা নিবন্ধ 'জাপানি সাংবাদিকদের চোখে রবীন্দ্রনাথ : ১৯১৬' প্রকাশিত হয়।

শান্তিনিকেতনে থাকতেই আজুমা সান রবীন্দ্র রচনা অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর এনড্রুজ পল্লীর বাড়িতে সেই সময়েই দেখেছি বাংলা বই আর ধরে না। বাংলা বইয়ের এত বড় লাইব্রেরি সেদিন শান্তিনিকেতনে অন্য কোনো বাড়িতে সুলভ ছিল না। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের রচনাই ছিল আজুমার মুখ্য কৌতুহল চিন্তা চর্চার বিষয়।

১৯৬৭ থেকে ৭১ এই কয় বছর আজুমা শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। তারপর জাপানে ফিরে যান। তারপর থেকে শুরু হয় আমাদের পরস্পরের চিঠিপত্রের আদান প্রদান। ইদানিং সেটা বন্ধ হয়েছে আমার বাড়িতে টেলিফোন এসে যাওয়ায়। জাপানে ফিরে ১৯৭১ এর জুলাইয়ে তিনি আমাকে যে-পত্র দেন, তাঁর বাংলায় লেখা চিঠির একটি নমুনা হিসেবে এখানে তুলে ধরছি —

"বাংলা দেশ থেকে এখানে চলে আসার পর চার মাস হয়ে গেল আমার। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন বিশেষ করে আপনার সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। আপনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি আমার ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছেন। আমি কতবার কত উপকৃত হয়েছিলাম আপনার কাছে। আপনি নিশ্চয় ভাল আছেন ও আপনার পত্নীও সুস্থ আছেন। আপনার সঙ্গে কাজ করেছি সেটা খুব আমার মনে আছে। আমি জাপানে চলে আসার পরে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। আপনি আমাদের ভুলে যাবেন না। আমাদের নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি আজুমা"

সেই ব্যস্ততা আজও তাঁর চলেছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত। তাঁরই উদ্‌যোগে, অন্যতম সম্পাদকতায় জাপানি ভাষায় যে-বিশাল রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের লেখার সিংহভাগ অনুবাদ আজুমাসানেরই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর লেখা বই 'টেগোর'ও তাঁর এক অসামান্য কীর্তি। জাপানে তাঁর স্বগৃহে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বইয়ের সংগ্রহ দেখে যে কোনো বাঙালি বুদ্ধিজীবী ঈর্ষাবোধ করবেন।

বিশ্বভারতীতে নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর একক অক্লান্ত অদম্য পরিশ্রমের প্রয়াস আজ সফল হয়েছে। এই কাজে তাঁর ইচ্ছাশক্তি আগ্রহ ও তৎপরতা দেখে অভিভূত হয়েছি।

বিশ্বের দরবারে আজও যে সব বিদেশী মনীষী রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচার করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ অধ্যাপক কাজুও আজুমা। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন এবং শিক্ষিত বাঙালি সমাজ এমন এক জাপানি-বন্ধু পেয়ে ধন্য হয়েছে।

‘মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে’

রামবহাল তেওয়ারী

ছোটবেলায় পড়েছিলাম

‘নুয়ে পড়ে ফলভরে পাদপ নিচয়,
জলদ জলের ভারে কত নত হয়।
গুণ ভরে গুণী যারা আগে নত হয় তারা
তোষে সবাকার মন করিয়া বিনয়,
মহতের চিরদিন এই পরিচয়।’

কিন্তু এ-রকম সুবিনীত মহত্ত্বের নিদর্শন দুর্লভ। আর দুর্লভের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তো থাকেই। তাই আমারো ছিল এবং আছে। মাঝে মাঝে অতীতের বা বর্তমানের ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বে সে আকর্ষণ চরিতার্থ হয়ে থাকে। অনুরূপ বিনম্র ব্যক্তিত্বের নিদর্শন অধ্যাপক কাজুও আজুমা। তাঁর সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন, কথা বলেছেন, তাঁর জীবনের অভিলক্ষ্যের পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা সবাই সে-কথা জানেন। সাধারণ ভাবে বিনম্রতা, সৌজন্য, সুরুচিসম্মত সম্ভ্রমবোধ জাপানি-জাতীয় চরিত্রের একটি লক্ষণীয় দিক। অধ্যাপক আজুমা যেন এই বিশেষত্বের প্রতিমূর্তি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অদম্য জ্ঞানস্পৃহা—ভারতের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংস্কারাদির বৈচিত্র্যে মুগ্ধতা, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা, দেশ জাতি তথা বিশ্বকে নিয়ে বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার ও মানব কল্যাণের সুগভীর পরামর্শ-সর্বোপরি রবীন্দ্রপ্রীতি। এসবের জন্যই বলতে ইচ্ছে করে অধ্যাপক আজুমা যতটুকু জাপানি তার চেয়ে অধিক বাঙালি ও ভারতীয় যাঁর প্রবণতা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দিকে।

জাপানে জার্মান ভাষার অধ্যাপক কাজুও আজুমা শান্তিনিকেতনে আসেন জাপানি ভাষার অধ্যাপক হয়ে ১৯৬৭ সালে। কিছু দিনের মধ্যেই জানা যায় তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতিময় পরিবেশকে বুঝতে ও আপন করতে। তার জন্য প্রথমে চাই বাংলাভাষা শিক্ষা। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। বাংলা পাঠ আরম্ভে বিস্ময়ের সঙ্গে জানলাম তিনি জাপান থেকেই বাংলা শিখে এসেছেন। চলন্তিকা অভিধান ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তাঁর নিত্য-সঙ্গী। চলন্তিকার পরিশিষ্ট অংশটুকু তাঁর রপ্ত এবং মাঝে মধ্যে এমন সব জিজ্ঞাসা তুলে ধরছেন যাতে বাংলা ভাষার অনতিলক্ষ প্রকৃতির বিশিষ্টতা নিহিত। এ-ব্যাপারে শ্রীমতী আজুমাও পিছিয়ে ছিলেন না। তিনিও শুরু করলেন ‘বলাকা’ কাব্যপাঠ। পরে কাব্যটি তিনি জাপানিতে অনুবাদ করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্ব পেল বলাকার বিচিত্র ছন্দের কথা। রবীন্দ্র সাহিত্যের নানা শাখার বিচিত্র প্রসঙ্গের মতো ছন্দও অধ্যাপক আজুমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ধীরে ধীরে ছন্দের গভীরে

প্রবেশ করেন। জাপানি ভাষায় রবীন্দ্র ছন্দের আলোচনা শুরু করেন। গীতাঞ্জলির ১৫৭টি কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ করে জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় তিনি প্রকাশ করছেন কয়েক খণ্ডে। তিন-চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে। জাপানি-ভাষায় কবিতার ছন্দের তেমন কদর নেই। তা সত্ত্বেও আজুমা ছন্দ-রসিক ও ছান্দসিক হলেন রবীন্দ্রনাথের টানে। জাপানি পাঠকে রবীন্দ্র-ছন্দরসের আস্বাদ দেবার জন্য এবং রবীন্দ্র-কাব্যপাঠকে রসোত্তর্ণ করার মানসে তিনি কি অসাধ্য-সাধন করেছেন তা একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়। বহুভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র কাজুও আজুমা কাব্যরসাস্বাদনে ছন্দের গুরুত্ব সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেন। তাই জাপানি ছন্দের উন্নতি সাধন ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির বিষয়েও তিনি সচেষ্ট। আগ্রহী ব্যক্তির সঙ্গে জাপানি ছন্দ নিয়ে আলোচনাতেও তিনি সমান আগ্রহী।

কেবল সাহিত্যর ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতি-শিল্প, আহার এবং জীবনচর্যার ক্ষেত্রেও জাপান ও ভারতে মিলন ও সমন্বয় ঘটুক এ তাঁর একান্ত ইচ্ছা। তারজন্য বিবিধ ও বিচিত্র প্রয়াসের শেষ নেই। জাপানে নিজের বাড়ির নাম রেখেছেন'শান্তিনিকেতন'। ভারতীয় তথা বাঙালি ভোজনের নানা উপকরণ সুরক্ষিত তাতে। তিনি নিজে যেমন কখনো একা, কখনো স্ত্রীপুত্র-কন্যা এবং দিদিকে নিয়ে ভারত ভ্রমণ ও শান্তিনিকেতন দর্শনে আসেন তেমনি বহু জাপানি পুরুষ ও নারী, যুবক-যুবতীর দল পরিচালনা করেও আনেন। জাপানি ছাত্র-ছাত্রীর আসা-যাওয়া তো অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর অনুরাগে। বেশ কয়েকজন বাঙালিও তাঁর উদ্যোগে ভ্রমণে বা অন্য উদ্দেশ্যে জাপানে গেছেন। অন্যভাবেও মানুষের জাপানে যাওয়া-আসা তো লেগে আছে। এদের মধ্যে যাঁরা 'শান্তিনিকেতনে' যান তারা সেই বিদেশে-বিভুঁয়ে বাঙালি-ভোজনে আপ্যায়িত হন। তাতে অতিথির বিস্ময় এবং গৃহস্থের আনন্দের সীমা থাকেনা। অন্যদিকে বেশ কিছু বাঙালির গৃহস্থালীতেও জাপানি জীবন ও সংস্কৃতির উপকরণ শোভা পাচ্ছে ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করছে। এই যে যাওয়া-আসা, দেওয়া-নেওয়া, সংস্কার-সংস্কৃতির বিনিময় আজকের জগতে তার মূল্য অস্বীকার করা যায়না। আর এসবের মূলে যে ভারত ও জাপানের সংস্কৃতির সমন্বয়সাধক অধ্যাপক কাজুও আজুমার উদ্যোগ এবং অবদান রয়েছে সেকথা না বললেও চলে।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম হল সাহিত্য। বাঙালি তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে রবীন্দ্র সাহিত্যে যেমনটি পাওয়া যায় তেমনটি অন্যত্র নয়। তাই অধ্যাপক আজুমা রবীন্দ্র সাহিত্যের নির্বাচিত অংশ জাপানি ভাষীদের উপহার দেবার মানসে - জাপানের বাংলাভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত বন্ধুদের নিয়ে একটি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন। যা 'জাপানি ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ ও প্রকাশ' নামে পরিচিত। যজ্ঞটি সুসম্পন্ন ও সুফলপ্রসূ হয়েছে। জাপানে তো বটেই ভারতেরও কোনো প্রতিষ্ঠানে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশটি খণ্ড সমাদরে গৃহীত হয়েছে। অধ্যাপক আজুমা এবং আরো অনেকে বেশ কিছু বাংলা উপন্যাস আদি জাপানিতে অনুবাদ করছেন। আজুমা আর কিছু মূল্যবান জাপানি গ্রন্থেরও বাংলা অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে জাপানি ভাষায় একটি

মনোজ্ঞ ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেছেন। সেটি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও জাপান বিষয়ে একটি বৃহৎ ও মহৎ গ্রন্থ রচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। এ-বিষয়ে যে পরিমাণ উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেছেন তা অকল্পনীয়। এখন সেই তথ্য সমুদ্র থেকে মুক্তো আহরণের কাজ চলছে। বলাই বাহুল্য এই পরিকল্পনার রূপায়ণ সময় সাপেক্ষ। তবে তা যে সুসম্পন্ন হবেই তাতে সন্দেহ নেই। কারণ অসাধ্য সাধনই অধ্যাপক কাজুও আজুমার চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা।

শান্তিনিকেতনে নবনির্মিত 'নিপ্পন ভবন' বা জাপান-ভবন আজুমা সানের অসাধ্য সাধনের এক অতুলনীয় নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বেশ কয়েকজন জাপানি শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলেন। কিন্তু যথার্থ উদ্যোগী ব্যক্তির অভাবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছিল না। অধ্যাপক আজুমা প্রথম বার শান্তিনিকেতন দর্শনের পর দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং শান্তিনিকেতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। স্থাপিত হয় জাপান-ভারত মৈত্রী সংস্থা। সংগৃহীত হয় অর্থ। শুরু হয় তাঁর জাপান শান্তিনিকেতন ও দিল্লী ছোটাছুটি। কেটে যায় দশ-বারো বছর। অবশেষে সব প্রতিকূলতা-অনুকূলতার রূপ নেয়। নির্মিত ও স্থাপিত হয় 'নিপ্পন ভবন'। জাপান ভারত, বিশেষ করে জাপান ও রবীন্দ্রসংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজ ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা এবং আনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এবং নৈকট্যস্থাপনের উদ্দেশ্যেএই নিপ্পন ভবনের প্রতিষ্ঠা। আশানুরূপবস্থায়, ধীর-স্থির গতিতে সুচারুভঙ্গিতে নিপ্পন ভবনের কার্যধারা অগ্রসর হচ্ছে। অধ্যাপক আজুমা নিরলসভাবে অক্লান্ত মনোবলে শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া অব্যাহত রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান ও দিক সন্দর্শনে ভবনটিকে উদ্দিষ্ট পথে সংচালিত করছেন।

অধ্যাপক কাজুও আজুমার নির্দেশনায় বাংলা ও জাপানি ব্যাকরণ নিয়ে তুলনামূল গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরো উচ্চতর স্তরে অনুরূপ গবেষণা চলছে।

স্বাভাবিক কারণেই শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক স্তরের প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে অধ্যাপক আজুমা সুপরিচিত। পরিচিত বাংলার অন্যত্রও। কলকাতার বিদ্বৎ-সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি-অনুরাগী গোষ্ঠী এবং অন্য মহলেও তিনি সুপরিচিত। যেখানেই কোনোক্রমে জাপান-ভারত বা রবীন্দ্রনাথ ও জাপানের প্রসঙ্গ ওঠে সেখানে অধ্যাপক আজুমার নাম উচ্চারিত হবেই। এখানেই তাঁর আসল পরিচিতি ও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি আজুমার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ, আসলে-বুদ্ধের দেশ ভারত ও বৌদ্ধভাবের রবীন্দ্র-চিন্তার অভিব্যক্ত রূপের প্রতিই প্রকাশিত। মূলভাবের সঙ্গে প্রবাসীভাবের মিলন আকাঙ্খাও মিল আকাশ লক্ষ করার মতো। মিলন শুভ হোক, সার্থক হোক, কল্যাণময় হোক! এই মিলন-যজ্ঞের হোতা কাজুও আজুমা।

কল্যাণমিত্র অধ্যাপক কাজুও আজুমা

ধর্মপাল মহাথের

বাংলা ভাষার মহান পূজারি, ভারতপ্রেমিক, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কাজুও আজুমার ৬৫তম জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধাভিনন্দন জানাবার সুযোগ পেয়ে বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ আজ পরম আনন্দিত। তিনি ১৯৬৭ সালে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন জাপানি ভাষার অধ্যাপক হিসাবে। এই নিরহঙ্কারী, মিষ্টভাষী অধ্যাপকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৮ সালে আমাদের ধর্মাঙ্কুর বিহারে। কোন কার্যোপলক্ষে তিনি কলকাতায় এলে আমাদের বিহারেই থাকতেন। প্রথম দিন তিনি এসেই আমাকে বলেছিলেনবিশ্বভারতীর প্রাক্তন জাপানী অধ্যাপক Prof. Kazugai আমাকে বলেছেন কোলকাতায় এলে এখানে থাকতে, তাই এসেছি।

আমাদের শিশুবিদ্যালয় কৃপাশরণ কন্টিনেন্টাল ইন্‌ষ্টিটিউশন শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। আমাদের এই Monastic শিশু বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও নানা ধর্মের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে একাত্ম হয়ে চলার পদ্ধতি দেখে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি আমাদের শিশু বিদ্যালয়কে অত্যন্ত ভালবাসেন।

অধ্যাপক আজুমা বিশ্বভারতীতে প্রায় সাড়ে তিন বছর জাপানি ভাষার অধ্যাপনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভীরভাবে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭১ সালে জাপানে ফিরে গিয়েও বাংলা ভাষা এবং রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার সাধনা থেকে বিরত হননি। তার ফলেই বর্তমানে তিনি বিদেশীদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞের সম্মান লাভে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রাণপণ উদ্যোগে অদম্য উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ এবং কবিগুরুর অন্তরের স্বপ্ন শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ শুভকর্ম বাস্তবায়িত করতে অধ্যাপক আজুমা যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার তুলনা নেই। এ উপলক্ষে তিনি বছরে ২।৩ বার ভারতে এসে তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে দিল্লী পর্যন্ত অনেকবার ছুটাছুটি করতে হয়েছে। এত সরলচিত্ত, মিষ্টভাষী, পরোপকারী, ত্যাগী, অসম্ভব উদ্যোগী, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতায় বিগলিত সাত্ত্বিক মানুষ আমি দেখিনি।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করে। বুদ্ধের দেশ ভারতবর্ষের প্রতি জাপানি বৌদ্ধদের শ্রদ্ধাভক্তি যে কত গভীর তা কল্পনা করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমি একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। বিশ্বভারতীর কলাভবনের এক প্রাক্তন ছাত্র হিদেকী নিশিওকা আজুমার বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন টোকিওর উপকণ্ঠে একটি গ্রামে। সন্ধ্যার সময় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই এসেছিল আমাকে দেখার জন্য। তাঁদের মধ্যে

অশীতিপর পাঁচজন বৃদ্ধা মহিলা আমাকে জাপানিদের প্রার্থনা বা মন্ত্রপাঠ শোনাতে চান। আমিও শোনার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তাঁরা প্রত্যেকে বাম হাতে দুটা করে বাঁশের কাঠি দিয়ে কাঁশার থালা বাজিয়ে এবং ডান হাতে একটি কাঠি দিয়ে কাঁশার কলশী বাজিয়ে "নমো অমিতাভো নমো অমিতাভো" শুধু এই দুটি শব্দ সুমিষ্ট সুরে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে থামলেন। মধুর সুরে জাপানি প্রার্থনা শোনানোর জন্য খুব ধন্যবাদ দিলাম। তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা এই প্রার্থনার অর্থ বোঝেন কি ?' সবাই বললেন'না-না, এর অর্থ বুঝি না।' বললাম এর অর্থ হল অমিতাভ বুদ্ধকে নমস্কার।' শুনে সকলেই পরম আনন্দিত হলেন। সেদিন ভারতের প্রতি জাপানি বৃদ্ধা মহিলাদের শ্রদ্ধা দেখে অভিভূত হয়েছিলাম।

ইচিকাওয়া শহরে অধ্যাপক আজুমার বাড়িতে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি ছিলাম। সেখানে তাঁর বৃদ্ধ মাতাপিতাকে দেখি। লক্ষ্য করেছি তাঁদের পবিত্র হৃদয় কুসুমের মত কোমল। আমার প্রতি তাঁদের প্রাণঢালা স্নেহ, গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। নিজের মাতাপিতার কাছেও আমি এমন স্নেহ ভালবাসা পাইনি। তখনই মনে হয়েছে অধ্যাপক আজুমা যোগ্য মাতাপিতার সুযোগ্য সন্তান। আর যোগ্য স্বামীর সুযোগ্যা পত্নী হলেন শ্রীমতী কেইকো আজুমা। শ্রীমতী আজুমা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক। জাপানে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের আলাদা এক মর্যাদা আছে। অধ্যাপক আজুমার বাড়িতে ভারত থেকে বিদগ্ধজনের আনাগোনা অব্যাহত। এঁদের প্রতি তাঁর আন্তরিক আতিথেয়তা আর প্রাণঢালা সেবা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। ভোর চারটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের দুই ছেলে আর দুই মেয়ে। এদের চারজনকে স্কুলে পাঠানো আর সাংসারিক যাবতীয় কাজকর্ম সারতে তাঁর প্রাণান্তকর অবস্থা। দু-পা এক জায়গায় রাখা অসম্ভব। জাপানে বাড়ির কাজ করার লোক রাখা খুবই কঠিন। তাই সংসারের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে হাসিমুখে পালন করেন শ্রীমতী আজুমা। অধ্যাপক আজুমা সকাল ৭-৮টায় নিশ্চিন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। তিনি সাংসারিক কাজের কোন খবরাখবর রাখেন না। শ্রীমতী আজুমাকে দেখে মনে হয় এবাড়ীর কোন কাজের মহিলা। সদা ব্যস্ততার ফাঁকে তিনি স্বামীর বিদ্যাচর্চায় নানাভাবে সাহায্য করতেন। বাংলায় কথা বলার অভ্যেস রাখার জন্য এঁরা উভয়ে বাংলায় কথা বলতেন। কোন সময় ভারতীয় অতিথিরা বৈঠকখানায় বসে থাকলে, কোন গোপনীয় কথা থাকলে, তখন জাপানি ভাষায় কথা বলতেন।

ইচিকাওয়া শহরে নাকাকোকুবুণ্ রোডে আজুমার পিতা অতি কষ্টে পাঁচ কাঠা জমি ক্রয় করে রেখেছিলেন। এই জমির অর্ধেক অংশে বাড়ি তৈরি অর্ধসমাপ্ত রেখে ১৯৬৭ সালে তিনি শান্তিনিকেতন চলে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৭১-এ ফিরে গিয়ে ঐ বাড়ির কাজ শেষ করেন। পাইন কাঠ দিয়ে জাপানি ডিজাইনের এই বাড়িটি খুবই সুন্দর। ১৯৭৩ সালের ৩০ মে আমি যখন প্রথম জাপানে যাই তখন বাড়িটি সদ্যসমাপ্ত। নীচের তলায় চারটি শোবার ঘর, রান্না ঘর, দুটি স্নানঘর, একটি ড্রয়িং রুম আর একটি লাইব্রেরি। উপরের তলায় হল ঘর। তাঁর বৃদ্ধ মাতাপিতা এই হল ঘরেই থাকতেন। এর একদিকে পূজা-বেদী —

অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তি। সর্বদা ধুপ-ধূনার সুগন্ধে ভরপুর। অন্যদিকে একটা টেবিলের ওপর টিভি সেট। সেখানে আজুমার মাতাপিতা মহাসুখে কালাতিপাত করতেন। আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন নীচের তলায় সুন্দর এক রুমে। মাঝে মাঝে আমি দোতলায় উঠে যেতাম। আমাকে পেয়ে ওঁরা দুর্বোধ্য জাপানি ভাষায় যা প্রকাশ করতেন, তা বুঝতে না পারলেও তাঁদের প্রাণঢালা ভালবাসা গভীরভাবে উপলব্ধি করে এক অপার আনন্দ পেতাম। নীচে আজুমার লাইব্রেরিটি ছিল শান্তিনিকেতনের অনুকরণে। দশ-বারোটা আলমারিতে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরাট সংগ্রহ শোভা পাচ্ছে। দেওয়ালে টাঙানো আছে রবীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত কিছু ছবি। এই লাইব্রেরিতে প্রবেশ করলে মনে হবে শান্তিনিকেতনের কোন অধ্যাপকের ঘরে যেন বসে আছি। এই বাড়িতে বসেই তিনি শান্তিনিকেতনের বাতাবরণ উপলব্ধি করে রবীন্দ্র ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন।

এই বাড়ির খালি জমিতে আগাছায় পূর্ণ হয়ে এক জঙ্গলে যেন পরিণত হয়েছে। এই জঙ্গলে অবস্থিত এক গাছে বাসা বেঁধেছিল একজোড়া বুনো পায়রা। এই পায়রা দুটি রোজ সকালে ডাকত, এই ডাক আমার খুব ভাল লাগত। সাধারণত জাপানে কাক ছাড়া অন্য কোন জাতের পাখি দেখা যায় না। এই দুর্লভ বুনো পায়রা কোথা থেকে এখানে এসে জুটলো, তা ভেবে আমি কুলকিনারা পাইনি। এক কথায় বাড়িটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আজুমাকে উদ্দীপিত করেছে রবীন্দ্র চর্চায় রত থাকতে। আজুমা নির্মিত এই মিনি শান্তিনিকেতনে ভারতীয় বিদগ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী, বিখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রকর, সঙ্গীত-নৃত্যশিল্পী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী ও ভ্রমণার্থীদের আনাগোনার ফলে এটি এক পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েয়ে।

ভারতের সঙ্গে জাপানের নতুন করে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ মধ্যমণি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। জাপানের পক্ষ থেকে বলা যায় টেনসিন ওকাকুরাকে। ১৮৯৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় ভারতীয় ও জাপানি প্রতিনিধিদের মধ্যে পরিচয় ঘটে। এশিয়ায় প্রাচ্য ধর্মসভা আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়ে ১৯০২ সালে ওকাকুরা ভারতে আসেন। তাঁর সঙ্গে এখানকার অনেক মনীষীর পরিচয় হয়। তিনি জাপানের অনেক তরুণকে ভারত ভ্রমণে, বিশেষত পালি সংস্কৃত শেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এ প্রসঙ্গে আর. কিমুরার নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯০৮ সালে যিনি পালি শেখার জন্য চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন ধর্মবংশ মহাস্থবিরের কাছে। পরে শান্তিনিকেতনে যান। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে অধ্যাপনাও করেন। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনে যাঁরা ছাত্র হিসেবে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হোরিসানের নাম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে ইয়োকোই কোশির আঁকা 'অন্ধের সূর্যবন্দনা' ছবি দেখে খুবই মুগ্ধ হয়ে ছবিটির একটি কপি চান। কাম্পো আরাই তা করে দেন। তারই আমন্ত্রণে কাম্পো আরাই শান্তিনিকেতনে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে প্রথম যখন জাপানে যান তখন টোকিও Ueno অঞ্চলের বিখ্যাত Kanenji Temple-এ তাঁর এক রাজকীয় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায়

জাপানের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য, জাপানের রাজবংশের সদস্য, টোকিওর পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধভিক্ষুরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের সংবাদ ও ছবি জাপানের বিখ্যাত ৬-৭টি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেই বিবরণী পড়লে শুধু বাঙালিরাই নয়, যেকোন ভারতীয় গর্ব অনুভব করবেন। রবীন্দ্রনাথের গভীর কণ্ঠে, ভাবগম্ভীর বক্তৃতা উপস্থিত সকল শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিল। বাংলায় প্রদত্ত কবিগুরুর বক্তৃতা জাপানিতে অনুবাদ করেছিলেন আর কিমুরা। এসব বিষয় জাপানি ভাষা থেকে অনুবাদ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অধ্যাপক আজুমা।

অধ্যাপক আজুমা ভারতীয় ছাত্রদের জাপান যাওয়া এবং জাপানি ছাত্রদের ভারতে আসার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। সাধারণত এসব কাজে সহজে কেউ এগোতে চায় না, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে অনেককেই সাহায্য করেছেন। উভয় দেশের ছাত্রদের উপকার করতে গিয়ে এই সাদাসিধা নিরীহ মানুষটি যে কত রকমের ঝামেলার সম্মুখীন হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর মত শান্ত, মৈত্রীপরায়ণ মানুষ বিরল। কেউ তাঁর ক্ষতি করলেও তিনি প্রতিশোধ নিতে পারেন না। স্বতপ্রণোদিত হয়ে কারও উপকার করতে গিয়ে তিনি চরম বিপদেও পড়েছেন, এরকম বহু ঘটনা আমার জানা আছে।

অধ্যাপক আজুমা আমাদের দেশের বহু গুণীজনদের আমন্ত্রণ করে জাপান যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে আমার জাপান ভ্রমণের ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন আমার পরিচিত জাপানিদের সাহায্যে। জাপানের ওসাকা, নারা, কিয়োতো, নাগায়া, হিরোসিমা, নাগাসাকি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দর্শন করি। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সম্বর্ধনা, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা প্রদান, বিশ্ববিখ্যাত সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান Rissho Kosei-kai-এর প্রতিষ্ঠাতা Rev. Nikkyo Niwano-র সঙ্গে সাক্ষাৎ ও এই সংগঠনের বিখ্যাত ফি উমোন হলে বক্তৃতা, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বাড়ি বর্তমানে হোটেল নাকামুরায়া-য় আমার সম্বর্ধনা, ভারত-জাপান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন-এ সম্বর্ধনা, Waseda Universityতে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা, জাপানের সৌন্দর্যময় শহর কিয়োতোর Nisshi Honganji Temple এর প্রধান Rev. Ohtani সঙ্গে সাক্ষাৎ, নারা শহরের Horiuji Temle, Yakshi Temple দর্শন সবই সম্ভব হয়েছে অধ্যাপক আজুমার সহৃদয়তায়। তাঁর মাধ্যমে জাপানের বহু বিশিষ্টজনের সাথে পরিচিত হয়েছি। এর ফলে আমাদের অতীশ ভবন নির্মাণে অনেক সাহায্য হয়েছে। তাঁর থেকে যা পেয়েছি, তুলনায় তাঁকে আমরা কিছুই দিতে পারিনি। এ লজ্জা চিরদিন থাকবে।

তাঁর এই শুভ জন্মদিনে তাঁকে আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। তথাগত সমীপে কামনা করি তাঁর শতায়ু।

জাপান ও ভারতবর্ষ

সুনীতিকুমার পাঠক

আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারে সৌর পৃথিবীর সব কিছু কাছাকাছি এসে গেছে। আগে তা ছিল না। জাপান পূর্ব এশিয়ার পূর্ব কোণে, আর ভারতবর্ষ দক্ষিণ এশিয়ায়' মাঝখানে দুস্তর সাগরের ব্যবধান।

জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ সরাসরি তেমন গড়ে উঠতে পারেনি। অথচ সেকালের জাপানিরা জানত যে ভারতবর্ষে একদিন গৌতম বুদ্ধ অবির্ভূত হয়েছিলেন। সেদেশ পবিত্রভূমি। কেবল যে বুদ্ধের দেশ বলে ভারতের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠতা তা বুঝি সবটা নয়।

একসময় চীন ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্ভার এশিয়ার দিকে দিকে প্রেরিত হোত। আবার এশিয়ার সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপেও এশিয়ার রেশম, সূতীর মিহিকাপড়, কাগজ, চামড়ার জিনিষ পত্রের ব্যবসা চলত। তাই একদেশের সওদাগর অন্যদেশে বাণিজ্যের জন্যে যাতায়াত করত। সওদাগরের সঙ্গে লোকলস্কর, উট, ঘোড়া, ছাড়াও কথক, কাহিনীকার, গায়ক বাদক এমন কি পুরোহিত ও ধর্মযাজকেরা দেশ দেশান্তরে চলত। তার ফলে তখনকার দিনে একদেশের সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, ধর্মচিন্তা সামাজিক রীতিনীতি অন্যদেশে বিস্তার লাভ করত।

জলপথের সওদাগরেরাও ডিঙি বোঝাই করে বাণিজ্য সম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে একদেশের সংস্কৃতির সম্পদ বহন করে নিয়ে যেত। ভারতবর্ষের সওদাগরেরা এই ভাবে ভারতবর্ষের পুরাতন সাংস্কৃতিক উপকরণ আশপাশের দেশ মধ্যএশিয়া, চীন, সিংহল ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে আদান প্রদান করেছিল। ঐ যুগে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ কতটা ঘটে ছিল তা সঠিক বলা কঠিন।

তবে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম চীন ও কোরিয়ার ভিতর দিয়ে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জাপানে প্রচারিত হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে জাপানের তীর্থযাত্রীরা ভারতবর্ষের পথে যাতায়াতের চেষ্টা করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা সফল হয়ে ওঠেনি। তবুও জাপানিদের অদম্য মনোবলের ফলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা চীনের পণ্ডিতদের থেকে জাপানে প্রবেশ করেছিল। যতদূর জানা যায় জাপানি বৌদ্ধ পণ্ডিত কুকাই বা কোবো দাইশি চীনে বসে ভারতীয় পণ্ডিত প্রজ্ঞার কাছে সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। কেননা, বৌদ্ধমন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা, তার অর্থ জানতে সংস্কৃত শিখতেই হবে।

কুকাই জাপানি ইরোহা কবিতা রচনা করেছিলেন, তাতে সংস্কৃত ভাষার স্বরক্রমের প্রয়োগ

জাপানি ভাষায় করা হয়েছিল। সংস্কৃত মন্ত্রের ধ্বনির প্রতিবর্নীকরণের জন্য পঞ্চাশটি ধ্বনি অক্ষরের এমনি ভাবে প্রচলন করা হয়। আবার ভিক্ষু আনেন সংস্কৃত শব্দকোশ রচনা তাঁর শিওনজো জাপানি ধ্বনি বিজ্ঞানের অভিনব রুপান্তর ঘটিয়েছিল। তার ফলে জাপানি লিপিতে স্বরধ্বনির নবীন বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। খ্রিষ্টিয় দশম শতকে তাকেতোরি মনোগোতরি জাপানি ভাষায় একটি স্বকীয় রচনায় বৌদ্ধ জাতক কথা ও বৌদ্ধ শীলচর্যার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

অনেকে মনে করেন, দক্ষিণ ভারতের বোধিসেন (৭০৪-৭৬০খৃঃ) জাপানে ৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে পদার্পণ করেন। তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত তিনি জাপানে ছিলেন। বোধিসেনের পরিচয় জাপানি ভাষায় একদিকে বরমোন সোজো অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরোহিত। নারা মন্দিরে দিয়াবুৎসু তথা বুদ্ধলোচন বা বৈরোচনের প্রতিষ্ঠা কল্পে বোধিসেনের অগ্রণী ভূমিকা তাঁকে আজও বরণীয় করে রেখেছে।

জাপান ও ভারতের এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আজও অব্যাহত চলেছে। জাপানি পণ্ডিতেরা অনেকে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কৌতূহলী। সেই উদ্যোগের পিছনে জাপানি বিদ্বান আর কিমুরার ১৯০৮ সালে ভারত ভ্রমণের কথা এসে পড়ে। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রা ঘটেছিল। তারপর থেকে শান্তিনিকেতনে সঙ্গে জাপানের পণ্ডিত, চিত্রকর ও ছাত্র-ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছে।

বিশ্বভারতীতে বর্তমানে নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠার মূলে আর একজন জাপানি বিদ্বানের সান্নিধ্য জাপান ও ভারতের ঘনিষ্টতাকে আরও নিবিড় করে তুলেছে। তিনি হলেন জাপানের সোকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও বিশিষ্ট রবীন্দ্রতত্ত্ববিদ ডঃ কাজুও আজুমা। তাঁর জীবন সাধনায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও আদর্শ তাঁকে অভিভূত করেছে। এই পরিণত বয়সে বাঙলা ভাষায় রবীন্দ্ররচনার গবেষণা তাঁকে রবীন্দ্রসাহিত্যের বীক্ষণে এক পথিকৃৎ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

কাজুও আজুমা : আবহমান জাপান-ভারত সংস্কৃতির ধারক

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী

বুদ্ধের মতবাদ বিস্তারের সূত্রে ভারতের সঙ্গে জাপানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধের মতবাদ কোরিয়া থেকে জাপানে পৌঁছে। এ প্রসঙ্গে আর একজন বৌদ্ধভিক্ষুর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি গৌড়ের মহাস্থবির বোধিধর্ম। ৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে এই গৌড়ীয় বৌদ্ধভিক্ষু তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে অর্ণবপোতে চিন যান। পরে জাপান। যাবার সময় তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র ও উষ্ণীষবিজয়ধারিণী নামে দুটি বই সঙ্গে নিয়ে যান। বই দুটি পরে জাপানের হোরিউজি মন্দিরে আবিষ্কৃত হয়। বোধিধর্মকেই চিনে বৌদ্ধমতের চ্যান শাখার প্রতিষ্ঠাতার সম্মান দেওয়া হয়। এই শাখাই জাপানে জেন বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত। বর্তমানে জাপান জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হয়েছে, এর মূলে রয়েছে জেন বৌদ্ধধর্ম। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক মাসুনাগা বলেন, 'এই পদ্ধতিতে ধ্যানের দ্বারা মন শান্ত ও সমাহিত হয়ে সবরকম শৃঙ্খলাহীন চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হয়'। মাসুনাগার মতে জেনের উৎপত্তি ভারতে, বিকাশ চিনের প্রয়োগিকতায় আর পূর্ণতা জাপানের সৌন্দর্যজ্ঞানে[১]। এই সৌন্দর্যজ্ঞান জাপানিদের জীবনকে সবদিকে প্রাণবন্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথের কথার, সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে, সেখানেই সে আপনার প্রগলভতা দূর করিয়া দিয়াছে'[২]। জাপানের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারুশিল্প, উদ্যানরচনা, পুষ্পবিন্যাস, নোহ্‌গীতি, রোঙাকাব্য, ওয়াকাছন্দ ; এক কথায় জাপানি জাতীয় জীবন জেন দ্বারা প্রভাবিত। জেন বলে : তোমার মনই বুদ্ধ। এই আত্মানুভূতি সব জাপানিকে বিপদের দিনে স্থির থাকতে শক্তি জোগায়। কামাকুরা যুগের শেষে যুদ্ধবিধ্বস্থ জাপানের কৃষ্টি যখন বিপন্ন সে-সময়ে জেন ভিক্ষুরাই তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।[৩]

মহাস্থবির বোধিধর্মকে আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু ভোলেনি চিন, জাপান। বুদ্ধের পরেই সেখানে তাঁর আসন।

ভারত, চিন আর জাপানের মধ্যে মেল-বন্ধন ঘটানোর একটা তাগিদ অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। তিনি মনে করতেন এই তিনটি দেশ মিলিত হলে গোটা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। বিখ্যাত জাপানি শিল্প-সমালোচক ওকাকুরা[৪]ও এক অখণ্ড এশিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারতে বসে লেখা তাঁর Ideals of the East (১৯০৩ খ্রি.) বইয়ের প্রথম কথা হল : Asia is one।

এই চিন্তা-চেতনার সার্থক অনুসারী হলেন অধ্যাপক কাজুও আজুমা। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পথটিকে সুন্দর করে তুলছেন। আশা করি অধ্যাপক আজুমার মত আরও উৎসাহী গবেষকরা ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার কাজকে ত্বরান্বিত করবেন। এমন একটি বই খুবই

জরুরি। অধ্যাপক আজুমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাঁরা গবেষণায় প্রবৃত্ত হবেন তাঁরা আজুমা-সানের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এ-কাজে অধ্যাপক আজুমার লেখাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। তাঁর কয়েকটি বই এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। আরও কয়েকটি প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর দুটি মূল্যবান নিবন্ধ আমরা প্রকাশ করতে পেরে খুবই তৃপ্তি বোধ করছি। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ[৫]-এ তিনি লিখেছেন, 'ভারত জাপানের সেতু আর কিমুরা'[৬]। এতে তিনি এমন সব বিষয়ে আলোকপাত করেন যা অনেকের অজানা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিমুরার পত্রালাপের প্রতিলিপি এবং আশুতোষ মুখার্জীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কিমুরার এক দুষ্প্রাপ্য ছবিও তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, যা ঐ প্রবন্ধে সংযোজিত হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও রাহুল সান্নিধ্যে ভারততত্ত্ববিদ ব্যোদো'[৭] বিষয়ে অন্য নিবন্ধটি তিনি লিখেছেন মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশত বর্ষ স্মারক গ্রন্থ[৮]-এ। জাপানের প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুসো ব্যোদো ১৯৩৩-এ শান্তিনিকেতনে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার ভার অর্পণ করেন বিধুশেখর শাস্ত্রীর উপর। শিক্ষা শেষে শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, 'এখন শান্তিনিকেতনে চীনা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে, তুমিও দেশে ফিরে গিয়ে জাপানীদের অনুরোধ করে শান্তিনিকেতনে জাপান ভবন নির্মাণের আপ্রাণ চেষ্টা করবে'। শিক্ষা শেষে ব্যোদো-সান জাপানে ফিরে যাওয়ার পর ১৯৩৫-এ রাহুল সাংকৃত্যায়ন জাপানে গিয়ে দু-মাস তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্যোদো-সান ভারতের এই মহান ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা জানিয়েছেন অধ্যাপক আজুমা-কে। দীর্ঘ নিবন্ধ দুটিতে তাঁর বিপুল শ্রমসাধ্য তথ্যানুসন্ধান ও উপাস্থাপনা নৈপুণ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। ভারত জাপান সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার পক্ষে লেখা দুটি মূল্যবান উপকরণ।

অধ্যাপক আজুমার নাম প্রথম শুনি ছাত্রাবস্থায়। ১৯৮০-তে যখন জগজ্জ্যোতি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করি, সে-সময়েই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তাঁর সঙ্গে আলাপ তথা দেখা সাক্ষাতের সেতু হলেন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার প্রাণপুরুষ ধর্মপাল মহাথের[১০]। পরিচয়ের সূচনাতেই অসঙ্কোচে আমাকে অনুজের মর্যাদা দিয়ে প্রীতি ও ভালবাসায় বেধে ফেললেন। তিনি আমার চেয়ে প্রায় কুড়ি বছরের বড়। বয়সের এ দূরত্ব আমাদের একমনা ভাবনায় কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। বাধা হয়নি অন্তরঙ্গ হতেও। তাঁর এক বিরাট গুণ বয়সের ব্যবধান ভুলে গিয়ে সবার সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ে অবলীলায় আলাপ জমাতে পারেন। অনেক দিন নানা প্রসঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নম্র সংলাপে মুগ্ধ হয়েছি। এমন একদিনও দেখিনি কারও নিন্দে করছেন তিনি। দেখিনি কোনদিন রাগ করতে। এক অসাধারণ মানুষ। এমন মানুষের সান্নিধ্যলাভ নিঃসন্দেহে গৌরবের। আমাকে তিনি আরও গৌরবান্বিত করেছেন 'বুদ্ধপ্রণাম'[১১] কবিতা সঙ্কলনটি প্রকাশ করে। বইটি প্রকাশ করে তিনি

বাংলায় লেখেন, 'হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী সম্পাদিত বুদ্ধ প্রণাম গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত'।

যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে তা হল বাঙালির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। বাংলাভাষা ও বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ। জাপানে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চাই তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তাঁর জীবন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। পেতে পারি আলোর দিশা। কোন লোভের জন্য, কোন পুরস্কার বা প্রশংসার জন্য তিনি একাজে আত্মনিয়োগ করেননি।

তাঁর মধ্যে দেখেছি মৈত্রী আর করুণার এক অপূর্ব সমাবেশ। বৌদ্ধধর্মের এই মূল বিষয় দুটিকে আমরা শাস্ত্রগত করে রেখেছি, কিন্তু তিনি একে করেছেন জীবনগত। তাই তিনি অজাতশত্রু। আধুনিককালের একজন বোধিসত্ত্ব বলেই তাঁকে আমার মনে হয়।

প্রসঙ্গসূত্র উল্লেখ :

১. *R. Masunaga, Soto Approach to Zen.*

২. *সৌন্দর্যবোধ (সাহিত্য)।*

৩. *D.T. Suzuki, Zen and Japanese Buddhism.*

৪. ওকাকুরা (১৮৬২-১৯১৩) বিখ্যাত জাপানি শিল্পরসিক ও সমালোচক। দীর্ঘদিন ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে গঠন করেন নিপ্পন বিজিৎসুইন, জাপানের প্রথম শিল্প আকাদেমি। ভারতীয় সংস্কৃতির অকৃত্রিম অনুরাগী ওকাকুরা প্রাচ্যের পুনরুত্থানের বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর পড়েছিল। ওকাকুরার সঙ্গে আলাপের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ জাপান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। তাঁর সঙ্গে আলাপের পরেই রবীন্দ্রনাথ চিন ও জাপান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণেই যে একদিন চিন ও জাপানের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল কবি সেকথা কোনদিন ভোলেননি। ১৯১১ খ্রি. ওকাকুরা শেষবারের মত কলকাতায় আসেন। ১৯১৩ খ্রি. ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার বোস্টন শহরে এই দুই মনীষীর শেষ সাক্ষাৎ।

৫. বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বা বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কলকাতার শতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাতা : কৃপাশরণ মহাস্থবির। প্রতিষ্ঠা সাল : ১৮৯২ খ্রি.। এরই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'Hundred Years of the Bauddha Dharmankur Sabha (The Bengal Buddhist Association) নামে ইংরাজি-বাংলা দ্বিভাষিক স্মারক গ্রন্থ। এর বাংলা অংশে (পৃ. ৮০-৯৪) অধ্যাপক আজুমার নিবন্ধটি ছাপা হয়েছে।

৬. রিউকান কিমুরা (১৮৮২-১৯৬৫)। ১৯১৮-২৬ খ্রি. পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পালি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পড়াশুনা করেছেন চট্টগ্রাম আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯১১ খ্রি.)। সে সময়েই জোড়াসাঁকোতে যাতায়াত শুরু করেন এবং

রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ পাঁচবার (১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২৪, ১৯২৯-এ দুবার) জাপান গিয়েছিলেন। প্রথমবার তিনি ইংরিজিতেই ভাষণ দেন। পরে কিমুরার সাহায্যে কবি সোজাসুজি বাংলায় ভাষণ দেন। (বিস্তৃত তথ্যের জন্য কাজুও আজুমা, 'ভারত জাপানের সেতু আর কিমুরা' দ্র.)

৭. সুসো ব্যোদো (১৯০৩-৯৩)। সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। দীর্ঘকাল জাপানের নিহোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৯১ খ্রি. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ব্যোদোকে সাম্মানিক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদান করে। গুরুদেবের ইচ্ছা পূরণে ব্রতী হয়ে স্থাপনা করেন 'নিপ্পন ভবন সংগঠন সমিতি'। অধ্যাপক ব্যোদো হন এর সভাপতি আর অধ্যাপক আজুমা সম্পাদক। ১৯৯১ খ্রি. মে মাসে আজুমাসানের সঙ্গে এসে অধ্যাপক ব্যোদো শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৯৪ খ্রি. ৩ ফেব্রুয়ারি উপরাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন এই নিপ্পন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ততদিনে ১৯৯৩ খ্রি. সেপ্টেম্বরে অধ্যাপক ব্যোদো মারা যান।

৮. রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩) এর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে লেখকের সম্পাদনায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শ্রদ্ধার্ঘ : Mahapandita Rahula Sankrityayana Birth Centenary Volume। ১৯৯৪ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর সভার কৃপাশরণ হলে গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি সদ্ব্যহার মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কাজুও আজুমা। এই গ্রন্থের বাংলা অংশে (পৃ. ৪০-৪৪) অধ্যাপক আজুমার নিবন্ধটি ছাপা হয়েছে।

৯. বুদ্ধচর্চা-বিষয়ক পত্রিকা। ১৯০৮ খ্রি. কৃপাশরণ মহাস্থবির এর প্রবর্তন করেন। প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির অধ্যাপক শ্রমণ পূর্ণানন্দ। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় (এশিয়াবাসীদের মধ্যেও প্রথম) ডি. লিট. (১৯১৭ খ্রি.) অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া-ও এক সময় এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন।

১০. ভদন্ত ধর্মপাল মহাথের বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের সর্বভারতীয় সংগঠন All India Bhikkhu Sanghaএর সভাপতি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনাকালে (১৯৬৭-৭১) অধ্যাপক আজুমা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। আজুমাসান কলকাতা এলেই তাঁর কাছে সভার অতিথিশালায় থাকতে ভালবাসেন। উভয়ের মৈত্রীবন্ধন ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে আরও মজবুত করেছে।

১১. রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নজরুল থেকে শুরু করে দুপার বাংলার দুশো জন কবির শ্রদ্ধার্ঘ। ১৯৯৩ খ্রি. ২২ অগাস্ট অধ্যাপক আজুমা কবিতা সঙ্কলনটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

বর্তমান জাপানি সাহিত্য

আশিস সান্যাল

'এ পর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি, সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়।' কথাগুলি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৯ সালে জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে রচিত 'জাপান যাত্রী' গ্রন্থে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ 'হ্যাইকু' জাতীয় কবিতা পাঠ করে। তিনি নিজে সপ্তদশ শতকের মাথাসুয়ো বাসোর 'হ্যাইকু' কবিতা বাংলাতে অনুবাদ করেছিলেন। একটি অনুবাদ এখানে উল্লেখ করছি।

'পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ'

মূল কবিতাটি ছিলো :

'ফুরুইকে ইয়া/ An old pond
কাওয়াজু তোবিকমু/ A frog leaped
মিজুনো ওতো/ Sound of the water.

জাপানি সাহিত্য সম্বন্ধে অধিকাংশ ভারতীয় পাঠকের এই ধারণা কিছুকাল আগেও ছিল। কিন্তু কাওয়াবাতা ইয়াসুনারী তাঁর 'স্নো-কান্ট্রি' উপন্যাসের জন্য ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর এই ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়। বাংলায় কাওয়াবাতার উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন জাপানের শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ কাজুও আজুমা (Kazuo Azuma)।

কাওয়াবাতার 'স্নো কান্ট্রি' উপন্যাসটিকে কেউ কেউ 'হ্যাইকু' রীতির অনুসরণ বলে মনে করেন। এই ধারাটিকেই তাঁরা মনে করতেন জাপানি সাহিত্যের সবচেয়ে বেগবান ধারা। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি পরিবর্তিত হলো য়ুকিও মিশিমার (Yukio Misima) উপন্যাসের অনুবাদ পাঠ করার পর। এখানে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হচ্ছে। মিশিমা কলকাতা এসেছিলেন ১৯৬৭ সালে। কলকাতার পার্ক হোটেলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন 'Bengali Literature' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতাম। বাংলা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হতো তাতে। নিতান্ত কৌতূহল বশতঃ আমি তাকে সেই পত্রিকার একটি সংখ্যা উপহার দেই। তাতে আমার 'একটি শোকসভা স্মরণে' শীর্ষক (ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী অনূদিত) একটি কবিতা ছিলো। হঠাৎ শুনতে পেলাম, মিশিমা তাঁর ভাষণের সময় সেই কবিতাটি পাঠ করছেন। আমার সেই তরুণ বয়সে আমি মোহিত হয়ে

গেলাম। মঞ্চ থেকে নেমে তিনি আমার খোঁজ করতে লাগলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার সমস্ত শরীর তখন উন্মাদনায় কাঁপছিলো।

১৯৭০ সালের ঠিক সময়টা মনে নেই। দিল্লী স্টেশন নেমে সেদিনের একটি সংবাদপত্র কিনে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখলাম, মিশিমা হারিকিরি করে আত্মহত্যা করেছেন। দুচোখের জল আমি চেপে রাখতে পারিনি। মিশিমা আমাকে তাঁর 'শিশুসাই' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ 'দি সাউণ্ড অব ওয়েভস্' উপহার দিয়েছিলেন। আমি তার কিছু অংশ বাংলাতে অনুবাদ করেছিলাম। কিন্তু প্রকাশের আগেই এই অধ্যায়ের শেষ হলো।

মিশিমা ছিলেন "Apres-Gucrre' গোষ্ঠীর লেখক। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'কিন্‌দাই বুনগাকু' বা 'আধুনিক সাহিত্য' ছিলো এই গোষ্ঠীর মখপত্র। মিশিমার উপন্যাসে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর জাপানের স্পন্দন যেন ধরা পড়েছে। তাঁর 'কামেন নো কাকুসাকু' (মিথ্যা স্বীকৃতি) উপন্যাসে স্বকাম ও আত্মরতির বলিষ্ঠ পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কনফেশনস্ অব মাস্ক' (মুখোশের স্বীকৃতি) আত্মচরিতমূলক উপন্যাস হিসেবে বিশেষ উল্লেখ্য। 'দি গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন', 'সি অব ফারটিলিটি' প্রভৃতি রচনা জাপানি সাহিত্য সম্বন্ধে ভারতীয় পাঠকদের দৃষ্টি পরিবর্তিত করেছে। জাপানি সাহিত্য যে ব্যাপক ও গভীর জীবনানুভূতিতে সমৃদ্ধ — সেই বিশ্বাস আজ সর্বজন স্বীকৃত।

এই গোষ্ঠীর অপর একজন হলেন হিরোশি নোমা (Hiroshi Noma)। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'শিনকু চিতাই' (শূন্য শলাকা) একালের জাপানি সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর ইয়াসুনারী কাওয়াবাতার নাম বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর আবির্ভাব সমকালীন জাপানি সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে। 'সোওয়া যুগ' থেকেই জাপানে বামপন্থী সাহিত্য রচনার পক্ষে অনুকূল হাওয়া প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। সারা বিশ্ব জুড়েই তখন এরকম একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো। জাপানি সাহিত্যেও 'সোওয়া যুগ' থেকেই বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। গঠিত হয় NAPF। এই সঙ্ঘের মুখপত্র 'সেনক'কে (রণ-পতাকা) কেন্দ্র করে বেশ কিছু কবি, লেখক ও নাট্যকার সমবেত হন। এর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় য়োশিএ হোত্তা (Yoshie Hotta)। মালার্মের অনুরাগী হিসেবে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর নবজন্ম ঘটায়। ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে তিনি রচনা করে যান একের পর এক উপন্যাস। এর মধ্যে উল্লেখ্য হলো The Loss of Motherland (1950), Loneliness in the Square (1951) এবং The Monument (1955)। দ্বিতীয় উপন্যাসটির জন্য তিনি আকুতাগাওয়া (Akutagawa) পুরস্কারে সম্মানিত হন। হিরোসিমার স্মৃতিতে রচিত তাঁর উপন্যাস The Trail একটি অসামান্য রচনা। জাপানে আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলনের তিনি পুরোধা।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে জাপানি

সাহিত্যের বলা যায় অন্ধ যুগ। কণ্ঠরোধ করা হলো গণ সাহিত্যের। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১৫ আগষ্ট ম্যাক আর্থার কর্তৃক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই অবার নতুন করে শুরু হলো তাঁদের রচনা। সাকুনোসুকি ওদা, ওসামু দাজাই প্রমুখ এই তিমিরাচ্ছন্ন অধ্যায়টিকে সাহিত্যের মুকুরে প্রতিফলিত করে চললেন। সকুনোসুকির মৃত্যু ঘটে আকস্মিকভাবে এবং ওসামু দাজাই করলেন আত্মহত্যা। এঁদের রচনা ছিলো বিদ্রুপে ভরা। কিন্তু জুনিইচিরো তামিজাকি (১৮৮৭) বা কাফু নাগাই প্রমুখ লেখকরা বেশ কিছু কালজয়ী উপন্যাস রচনা করে সমৃদ্ধ করলেন জাপানি সাহিত্যকে। হাকুচো মাসামুনে এই সময়কার শক্তিশালী লেখক।

যুদ্ধোত্তর কালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবার পর বামপন্থী লেখকরা 'নয়া জাপানি সাহিত্য' নামক পত্রিকার ছত্রছায়ায় সমবেত হন। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক গোষ্ঠীতে ছিলেন উজাকু আকুতা, কিয়োসি ইগুচি, য়ুরিকো মিয়ামোতো প্রমুখ। য়ুরিকো মিয়ামোতোর 'দুই বাগান' (১৯৪৭) ও 'দোহিও' বা 'মাইল স্টোন' ; সুনাও তোফুনাগার 'ঘুমাও, হে মোর প্রিয়া' (১৯৪৮) ; বা জুজি নাকানোর 'গোসাকু নো-সাকু' এই সময়ের উল্লেখ্য রচনা। বামপন্থী লেখকদের মধ্যে কাতজুমি সুগাওরা, রুমিকা কোরা, মাআকো তাকিগুচি, তুসাবুরো ওনো, মাকাতো ওদা, ইচিরো হারু প্রমুখ বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

এর বিপরীত দিকে ছিলো 'তেরোজনের ক্লাব'। এই গোষ্ঠীর লেখকরা ছকে বাঁধা জীবন চেতনার বাইরে মানুষের জীবনের গহণ প্রদেশে ডুব দিলেন। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইয়াসুনারী কাওয়াবাতার নাম। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একালের জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও ঔপন্যাসিক। তিনি 'স্নো-কান্ট্রি' বা 'বরফের দেশ' উপন্যাসটির রচনা আরম্ভ করেন ১৯৩৪ সালে। 'য়ুকিগুনি' অর্থাৎ 'বরফের দেশ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ১৯৬৭ সালে বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটিতে কাওয়াবাতা প্রাচীন হ্যাইকু কাব্যরীতিকেই অনুসরণ করেছেন, তাঁর সংলাপ কাব্যধর্মী ও সংক্ষিপ্ত। নায়ক সিমামুরা বিত্তবান, প্রেমবান অথচ ভালবাসায় অক্ষম। অন্যদিকে নায়িকা ইয়াকো গেইশা বারবণিতা ! উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করতে চেয়েছে। কিন্তু পরিণতিতে মিলিত হতে পারেনি দুজনে একান্তভাবে। যত কাছে আসতে চেষ্টা করছে, ততই যেন সরে গেছে দূরে। সিমামুরা একদিকে যেমন বিশ্বনিন্দুক অপর দিকে তেমনি স্বপ্নময় জগতে বিচরণকারী। পাপের মধ্যে পবিত্রতার অপূর্ব সামাবেশ ঘটেছে উপন্যাসটির মধ্যে। তিনি সিমামুরার প্রেমের প্রত্যাখ্যানকে সার্থক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে প্রাচ্য জীবনের রূপ। কাওয়াবাতার অপর উল্লেখ্য উপন্যাস হলো 'থাউজ্যাণ্ড ক্রেনস' (সহস্র সারস)। তিনি জাপানি সাহিত্যে 'নিওম্যান স্যুরিয়ালিস্ট' আন্দোলনের প্রবক্তা ও প্রধান পুরুষ। তেরোজনের ক্লাব গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আরও আছেন তাকিয়ো কাতো শিরোওজাকি, সুরাও নাকামুরা প্রমুখ।

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর জাপানি সাহিত্যে আরও অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

যুদ্ধের সময়ে গঠিত হয়েছিল 'আরেচি' (Arechi) কবি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রবক্তাদের মধ্যে আয়ুকাওয়া নোবুও (Ayukawa Nobuo) বিশেষ উল্লেখ্য। ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিক কবি টি এস এলিয়টের সাহিত্য দর্শনের দ্বারা এঁরা প্রভাবিত ছিলেন। 'আরেচি' কথাটির অর্থ ইংরেজিতে Waste Land, এই আন্দোলনের পাশাপাশি ১৯৫২ সালে 'রেটো' (Retto) গোষ্ঠীর আর্বিভাব জাপানি সাহিত্যের জীবনী শক্তিরই প্রমাণ। যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এলেন তানিকাওয়া শুনতারো (Tanikawa Shuntaro)। তাঁর রচনাও সহৃদয় জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত শোহেই ওওকা-র (Shohei Oaka) ফায়ার অন দি প্লেন, জাপানি সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন।

এখানে জাপানি সাহিত্য নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার অবসর নেই। শুধু কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে আরেক জন কবির কথা উল্লেখ করছি। তিনি হলেন শ্রীমতী কাজুকো শিরাইশি (Kazuko Shiriaishi)। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৯ সালে নভেম্বর এশীয় কবি সম্মেলনে। তাঁর কবিতায় একটা নতুন বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। দেখলাম, মিশিমার প্রতি তাঁর রয়েছে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। আমার সংগে মিশিমার পরিচয় ছিলো জেনে তিনি আমাকে তাঁর ইংরেজিতে অনূদিত একটি গ্রন্থ উপহার দেন।

ভারতের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক সুদীর্ঘ দিনের। ১৯০১ সালে বিশিষ্ট জাপানি শিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে আমন্ত্রণের জন্য। সেই সময়ে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির অবদান অপরিসীম। সেই অনুশীলন সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপটে ওকাকুরার অবদান অপরিসীম। তাই আজও ভারতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করে। আর কিমুরা, কাম্পো আরাই এবং য়োনে নিগুচির কথাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র বসু এবং বহু ভারতীয় বিপ্লবীর তীর্থভূমি ছিলো জাপান।

কাজুও আজুমা আজ সেই মহান দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। বাংলার জাপানি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবার কাজে তাঁর ও শ্রীমতী আজুমার অবদান স্মরণীয়। 'রবীন্দ্রনাথ : তাঁর চিন্তাধারা' বিষয়ক জাপানি ভাষায় রচিত আজুমার গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে জাপানের মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। বাংলায় কাওয়াবাতার উপন্যাস এবং কাম্পো আরাই-এর 'ভারত ভ্রমণ দিনপঞ্জি'র অনুবাদ সত্যই তুলনাহীন। এছাড়াও বাংলায় বহু প্রবন্ধ রচনা করে জাপান প্রাণসত্ত্বাকে বাংলার সাধারণ পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁকে বাংলাভাষী মানুষ চিরদিন শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখবে।

জাপানে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

এম.এইচ.কবীর

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিনিময় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো জাপানের টোকিও শহরে। গত ২৮ মে ১৯৯৫ বেলা ১টা ২০ মিনিটে শহরের অভিজাত অঞ্চল গিজ্জায় অবস্থিত গ্যাস হলে প্রখ্যাত জাপানি রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ড: কাজুও আজুমার স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। এবারের সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জাপানি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিরাট সংখ্যায় যোগদান। ইদানিং কোনও সাহিত্য সম্মেলনে নাকি এমন ঘটেনি।

ভারত থেকে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন আশিস সান্যাল ও ড: শ্যামসিং শশি। বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট নাট্যকার ও সমালোচক ড: কবীর চৌধুরী এবং বাংলাদেশ টেগোর রিসার্চ সেণ্টার-এর সভাপতি আহমদ রফিক এবং জাপান থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন জাপান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশক প্রখ্যাত লেখক সেনজি কুরোই এবং বিশিষ্ট সমালোচক তোশিও হিরাওকা।

প্রথমেই স্বাগত ভাষণ দেন ড: কাজুও আজুমা। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ পাঁচবার জাপান ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম ভ্রমণের সময় ইংরেজিতেই ভাষণ দিতে আরম্ভ করেছিলেন। পরে আর কিমুরার সাহায্যে সোজাসুজি বাংলায় বক্তৃতা দেন। কিমুরা জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রোতাদের সামনে। বর্তমান আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনটি এই দিক থেকে অভিনব। বক্তারা সকলেই নিজের নিজের মাতৃভাষায় ভাষণ দেন। সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির অনুবাদ হয় বিভিন্ন ভাষায় কেবল জাপানি ভাষায় নয়। আন্তর্জাতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে এই সম্মেলনটির গুরুত্ব অসামান্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এবারের সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন আশিস সান্যাল। তাঁর বিষয় ছিলো : 'সভ্যতার বর্তমান সংকট ও সাহিত্য'। তিনি বিশ্বব্যাপী মুল্যবোধের যে সংকট দেখা দিয়েছে, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেন, চিন্তা ও মননের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়েই মৌলবাদ বিভিন্ন রূপে মাথা চাড়া দিচ্ছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য কি করতে পারে ? তিনি সাহিত্যের ভূমিকাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর ভাষায় : 'ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি এমনকি দর্শনের চেয়েও সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সাহিত্য এসব কিছুকে ছাড়িয়ে যেতে এবং মানুষের আত্ম-উত্তরণের সহায়ক হতে পারে। অবশ্য সেজন্য সাহিত্যেও যুগের উপযোগী গতি সঞ্চার করতে হবে। ইন্দ্রিয় ও দেহের চাইতে চেতনাকেই প্রাধান্য দিতে হবে একুশ শতকের সাহিত্যে। অস্তিত্ব ও মানব-মুক্তির বিষয়টিকে দিতে হবে সর্বাধিক গুরুত্ব।'

একই বিষয়ে বলতে গিয়ে জাপানের লেখক সেনজি কুরোই বলেন : 'কেউ কেউ হয়তো এই মত পোষণ করেন যে, পৃথিবী এখন যে সংকটের সম্মুখীন তার মাঝে সাহিত্য কিছু করতে পারবে না এবং প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের অস্তিত্বের কোনও অর্থ নেই। এই নেতিবাচক ধারণাকে আমি পুরোপুরি নাকচ করবো না। এর মধ্যে কিছু বাস্তবতা পাওয়া যায় বৈকি। এ-কথা সত্য যে কোনও একটি কবিতা বা গল্প বাস্তবে পারমানবিক চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বহিরাগমন কখনো ঠেকাতে পারে না।...কিন্তু অপর দিকে, সাহিত্যের অবদান সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করা যায় এবং সেটি উপেক্ষা করা উচিত নয়।' প্রসঙ্গতঃ তিনি জানান যে, গত ১৭ই জানুয়ারি ভোরবেলায় জাপানের কোবে শহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। সাধারণতঃ এই ধরণের সংকটে আত্মীয়-স্বজন ও বাসস্থান হারানো মানুষদের আর্তনাদই শোনা যায়। কিন্তু এর তিন সপ্তাহ পরে যখন ত্রাণকার্য চলছিলো পুরোদমে, তখন একটি পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটিতে ছিলো, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পাঠকদের কাছ থেকে সেই কাগজে প্রেরিত কিছু 'তান্‌কা' জাতীয় কবিতা। এর দুই তিনদিন পর অন্য একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে যে এই ভয়ংকর ভূমিকম্পের ওপর সারা জাপান থেকে সাত হাজারেরও বেশি 'হাইকু' ও 'তান্‌কা' জাতীয় কবিতা সেই কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি 'তান্‌কা'র উল্লেখ করেন, যার মধ্যে একটি বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় : 'বিধ্বস্ত গৃহের তলায় বান্ধবীর লাশ। — এমন শোকের মধ্যেও এক অন্ধকার রাতে / আমার শুরু হলো রজঃস্রোত।' অভ্যাস না থাকলে এ-রকম কাব্যরচনা সম্ভব নয়। কবিতাটির মধ্যে মানব হৃদয় ও দেশের সেই চিরন্তন সত্য প্রকাশিত হয়েছে। রজঃস্রোত হলো প্রাণের প্রতীক। কবিতাটি থেকে জানতে পারি, বান্ধবীর মৃত্যুতে কবির শোক কতো গভীর।

সেই সঙ্গে মানুষের প্রাণশক্তির জোর কতো। উপসংহারে কুরোই বলেন : 'এখন থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিশ শতকের অবসান হবে। এমন সময়ে মানব সভ্যতা এবং মানব জাতির বহমান সংকটের বিশদ বিবরণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রাখা সাহিত্যের কর্তব্য।'

তোশিও হিরাওকার বিষয় ছিলো 'জাপানি সাহিত্যে হেমন্তকালের সন্ধ্যাবেলার তাৎপর্য'। তাঁর ভাষায় : 'হেমন্তকালের সন্ধ্যা কথাটার মধ্যে যে রস নিহিত আছে মধ্য যুগ কেন, বরং আরো অতীতকাল থেকেই তা জাপানিদের হৃদয়ে বিশেষ অনুভূতির সঞ্চার করে আসছে।...সন্ধ্যাবেলার জাপানি প্রতিশব্দ 'তাসোগারে'যার আভিধানিক অর্থ হলো 'কে সে ?', অর্থাৎ আলো কমে যাওয়ার ফলে যখন সব আলো আবছা হয়ে আসে, তখন সঠিক চিনতে না পারার জন্য সাধারণের মনে এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন জেগে ওঠে। জাপানি সাহিত্যে এই সন্ধ্যাবেলা এক অদ্ভুত তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। বহু লেখক হেমন্তের সন্ধ্যা নিয়ে বহু রচনা লিখেছেন। প্রবন্ধটির শেষ অংশে তাঁর মন্তব্য : 'বিশ শতকের অবসান ঘটবে আর পাঁচ বছর পর। তাহলে এটাই কি বিশ শতকের সন্ধ্যাবেলা ? আমরা কি চলতি শতকের

সন্ধ্যাবেলা প্রত্যক্ষ করছি ? আসন্ন একুশ শতক কি রাত বা শীতকাল '... আমাদের সামনে রাতের অন্ধকার শুধু ডানা মেলে বসে আছে। কিন্তু আমাদের কর্তব্য, রাতের পর ভোরকে অবশ্যই আসতে দেওয়া।'

ড: কবির চৌধুরীর বিষয় ছিলো 'সর্বজনীন মানবিকতা ও সাহিত্য'। তিনি প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা এবং বিশ্বসাহিত্যে সর্বজনীন মানবিকতার কথা উল্লেখ করে বলেন : 'যে সর্বজনীন মানবিকতা বোধ বিশ্বের তাবৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের অন্যতম উপজীব্য বলে আমরা সর্বদা লক্ষ্য করে এসেছি, আজ মনে হয় তা বিপর্যস্ত, বিপন্ন, মুমূর্ষু। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও নয়া বর্ণবাদ বর্তমান সময়ে বিশ্বমানবিকতাবোধকে নিরন্তর ক্ষুন্ন করে চলেছে। অথচ বিশ্বমানবিকতাবোধকে বিকশিত ও শক্তিশালী করতে পারলে যে বিশ্বশান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, শুভ ও কল্যাণের পথে আমাদের যাত্রা সুগম হবে তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।' তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালনসহ বহু বাংলা ও অন্য ভাষার লেখকদের রচনা থেকে উদাহরণ দেন।

আহমদ রফিক বাংলাদেশের সাহিত্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্য ধারা ও তার প্রবণতা' বিষয়ে বলেন। তাঁর বক্তব্যে নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ প্রকট হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন : 'উনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাহিত্য চেতনার প্রতিক্রিয়াজাত বিপরীত রূপটিই যেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা হিসেবে চল্লিশের দশকে এসে আত্মপ্রকাশ করেছে। ...১৯৪২ সালে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় পাকিস্থান রেনেসাঁস সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন হবিবুল্লাহ বাহার, আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। এক বছর পর ঢাকায় অনুরূপ সংগঠন পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এবং সৈয়দ আলী আহসান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তখনও বহুদূরে, তবু সেই স্বতন্ত্র ভুবনের স্বপ্ন নিয়ে মুসলিম সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চলে।' একালের বাংলাদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য : যুক্তিবাদ এখনও বাংলাদেশের সাহিত্যে যথেষ্ট গভীরতা ও ব্যাপ্তি নিয়ে পরিস্ফুট হয়নি।

শ্যামসিং শশি সমকালীন হিন্দি সাহিত্যের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি হিন্দি সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাহিত্যকে মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

এরপরে শুরু হয় মুক্ত আলোচনা। তর্কে-বিতর্কে সভাটি জমে ওঠে। বহু বিশিষ্ট জাপানি সাহিত্যিক এই মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন তোশিও তানাকা, নাওকি নিশিওকা, কাজুহিরো ওয়াতনবে, মঞ্জুলিকা হানারি, সমরেশ ধর প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নৃত্য, নজরুল-গীতি, লোকসঙ্গীত, জাপানি লোকসঙ্গীত ও হিন্দি গান। অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতি তোমোকো কাম্বে, আইয়ুমি

চিদা, আকিকো ইয়োয়ামা, এমিকো হানাওয়া, রীতা ধর, অদিতি দত্ত, কুমকুম মুখার্জী, সোনা ঘোষদস্তিদার, সুস্মিতা পাল, মঞ্জুলিকা হানারি ; বুলু সাহা, করবী মুখার্জী, রঞ্জন গুপ্ত, চুনী রায়, অলক কুণ্ডু, সুমনা কুণ্ডু, পাঞ্চালী মিত্র প্রমুখ জাপানি ও জাপান প্রবাসী বাঙালি শিল্পীরা। ধন্যবাদ জানান 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিনিময় সংস্থা'র জাপান শাখার আহ্বায়ক এম.এইচ. কবীর এবং সমাপ্তি ঘোষণা করেন তোকিও তানাকা। বিদেশী লেখকদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিলো গিঞ্জার বিলাস বহুল হোটেল আমাতাসু। শ্রীমতি কোইকো আজুমা ছিলেন অতিথিদের দায়িত্বে। ইদানিং কোনও সাহিত্য সম্মেলনে এবারের মতো বিশিষ্ট জাপানি লেখকদের সমাবেশ ঘটেনি বলে মন্তব্য করেন উপস্থিত জাপানি সাংবাদিকরা।

বর্তমান জাপানে রবীন্দ্রচর্চা

কেইকো আজুমা

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে জাপানিদের গভীর সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথ জাপানের সংস্কৃতি জাপানিদের গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করতেন এবং জাপানিদের ভালোবাসতেন। এটা জাপানিদের চিরস্মরণীয় গর্বের ব্যাপার। কিন্তু তিনি জাপানের অতিরিক্ত সমরবাদ ও অতিরিক্ত বাণিজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বলে কিছু জাপানি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিলেন। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি জাপানে রবীন্দ্রনাথের আর কেউ সমালোচনা করেননি। রবীন্দ্রানুরাগীর সংখ্যা এরপর থেকে বৃদ্ধি হতে থাকে।

১৯৪১ সালে মৃত্যুর কিছু দিন আগে তিনি ভবিষ্যতের সতর্ক বাণী "সভ্যতার সংকট" লিখে মহাযুদ্ধের আসন্নতার পূর্বানুভবের প্রকাশ করেছিলেন। জাপানিরা যুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথের শান্তিবাণী এবং সর্বজনিন মানবতাবাদে আকৃষ্ট হয়। যুদ্ধের পর রবীন্দ্রচর্চা ও প্রচারের প্রথম মহা ঢেউ উঠল রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীর সময়। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে জাপানে বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন দুজন মাত্র। একজন গোরা অনুবাদ করেছিলেন, আর একজন রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলা শিখে ১৯১৬ সালে কবিগুরুর প্রথম জাপান ভ্রমণের সময় দোভাষীর কাজ করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের পাঁচ ও ছ'দশক থেকে বাংলা ভাষা শেখার জন্য জাপানি ছাত্র ও গবেষকেরা কলকাতা, শান্তিনিকেতন ও বাংলাদেশে যায়। তারা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রচর্চার স্রোত প্রবল ও বিপুল ভাবে বহন করেছে।

কিন্তু জাপানে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রচার ও চর্চার ইতিহাসে মহাচিহ্ন রেখে দিয়েছেন বৌদ্ধধর্মের একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর নাম Shoko Watanabe। তিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রায় ৩০টি ভাষায় পারদর্শী। তিনি পালি, সংস্কৃত, তিব্বতী ও প্রাচীন চীনা ভাষায় জ্ঞান লাভ করে বৌদ্ধধর্ম এবং ন্যায় দর্শন সম্পর্কে বিবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের আকর্ষণে বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন। যেহেতু তাঁর ভাষায় বুৎপত্তি ছিল, সেইজন্য ভারতবর্ষে না গিয়ে অল্প সময়ে মধ্যে তিনি বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ঠিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় ১৯৬১ সালে তিনি সর্বপ্রথম মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯১৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নানা অনুবাদক ইংরেজি গীতাঞ্জলি জাপানি ভাষায় প্রায় দশবার অনুবাদ করেন। কিন্তু Shoko Watanabe রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মর্মভাব, আবেগ ও ছন্দ জাপানি ভাষায় যথার্থ অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমি প্রথমে তাঁর কাছে বাংলা ভাষা শিখেছি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে নানা পরিকল্পনা অনুসারে জাপানে নিম্নোক্ত বিবিধ অনুষ্ঠান ও কাজকর্ম পালিত হয়েছিল।

১. Apollon প্রকাশন থেকে ৭ খণ্ডের রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষা থেকে অনুবাদ করা। একটি ব্যতিক্রম উপরোক্ত Shoko Watanabe-এর গীতাঞ্জলি।

২. রবীন্দ্রজয়ন্তী মাসিক খবরের কাগজ "সত্য" ১৯৫১ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ২২ সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই তথ্যপূর্ণ কাগজে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শান্তিনিকেতনের জাপানি ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের স্মৃতিচারণ, জাপানিদের চোখে রবীন্দ্রনাথের পাঁচবারব্যাপি জাপান-ভ্রমণ বৃত্তান্ত, রবীন্দ্রসাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন, শিল্প ও সংগীতের পরিচয় ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

৩. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জানার জন্য বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

৪. জাপানের নানা স্থানে রবীন্দ্র চক্র তৈরি করা হয়।

৫. রবীন্দ্রজয়ন্তী সমিতির সম্পাদনায় রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী-স্মৃতি প্রবন্ধগুচ্ছ "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের লেখক ১৭ জন। তাঁদের মধ্যে প্রাচ্য সংস্কৃতি প্রেমী Kunihiko Okura, রবীন্দ্রনাথের ১৯২৯ সালের জাপান-ভ্রমণের সময় তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ভাবের আদান প্রদান করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের ধ্যান সম্প্রদায়ের পণ্ডিত Taisetsu Suzuki, তিনি ১৮৯৩ সালের Chicago-র Parliament of Religion-এ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষজ্ঞ Otoya Tanaka "রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় Classics" প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "আত্মচরিত"-এর অনুবাদক Kizo Inazu "দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তেনশিন ওকাকুরার-এর নাতি Koshiro Okakura লিখছেন "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান"। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক Shinya Kasugai-এর প্রবন্ধ "Schweizer-র বিচারে রবীন্দ্রনাথে র চিন্তাধারা" এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক Tatsuo Morimoto-র প্রবন্ধ "মানবতাবাদের রক্ষক রবীন্দ্রনাথ" অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬. টোকিওর বিরাট হলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বক্তৃতা ও রবীন্দ্রনৃত্য মঞ্চস্থ হয়।

৭. Kiitsu Sakakibara এশিয়া-নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের সভাপতি। তিনি ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক রাজকুমার সেনারিকের কাছে ভারতনাট্যমের গভীর শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং ফিরে এসে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রনৃত্যের প্রদর্শন করে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময়ও তাঁর সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন।

জাপানে বাংলা ভাষায় চর্চা ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ মূল বাংলা থেকে সম্ভব হচ্ছে। Shizuka Yamamuro, Hiroshi Noma, Tatsuo Morimoto এবং Kazuo Azuma-র যৌথ সম্পানদায় ১২ খণ্ডে সাত হাজার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-রচনাবলী জাপানি ভাষায় দাইসান বুম্মেই প্রকাশনালয় থেকে ১৯৯৩ সালে এপ্রিল মাসে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাবলীর প্রথম পরিকল্পনা ১৯৭৫ সালে হয়েছিল। সম্পূর্ণ হতে ১৮ বছর লাগল। উপন্যাস 'গোরা' 'দুই বোন' 'চার অধ্যায়'; নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জন',

'চিত্রাঙ্গদা', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'নটীর পূজা' 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ'; 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'শেষ লেখা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত বহু কবিতা, গল্পগুচ্ছ থেকে নির্বাচিত ৫৪টি গল্প, এবং নানা চিঠিপত্র ও ভ্রমণ কাহিনী ৪০টির উপর প্রবন্ধ অনুবাদ করা হয়েছে। চারজন সম্পাদক ছাড়া রয়েছেন ৩৫ জন অনুবাদক। এই রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ড হচ্ছে গবেষণা খণ্ড। সেখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় ৪১টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশে বিদেশের রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং রবীন্দ্রানুরাগীরা এই প্রবন্ধগুলি লিখেছেন। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের প্রবন্ধ এতে রয়েছে।

জাপানে রবীন্দ্ররচনাবলী ছাড়াও বাৎসরিক পত্রিকা "কল্যাণী" এবং "উজান যাত্রী"-তেও রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ ও পরিচয় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া নানা academic পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

Kyoko Niwa "জাপান ও রবীন্দ্রনাথ" থিসিস লিখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D. ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়েছেন। Kazuo Azuma "রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তাধারা" বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি শতাধিক ছাত্রছাত্রী সংগীত ভবনে, কলা ভবনে, বাংলা এবং হিন্দি ভাষার Foreign Casual Student Course, Diploma Course, Certificate Course-এ, দর্শন বিভাগে, ইতিহাস বিভাগে পড়তে এসেছে। আর জাপানি বিভাগ ও কলা বিভাগে মোট ৯জন জাপানি অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষকতা করতে এসেছেন। তাদের মধ্যে থেকে ১০ জন রবীন্দ্ররচনাবলীর অনুবাদক হয়েছেন।

আর দুজন প্রাক্তন ছাত্রীর কথা বলা প্রয়োজন। এক জনের নাম Tomoko Kambe। তিনি প্রথমত কবি ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গায়িকা। বিশ্বভারতীতে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তারপরে এই ২০ বছর ধরে প্রতি বছর শান্তিদেব ঘোষের নিকটে গিয়ে রবীন্দ্র সংঙ্গীত শিখেছেন।

তিনি জাপানে অনেক দিন রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্লাশ নিচ্ছেন। নানা উপলক্ষে নানা জায়গাতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার করছেন। প্রত্যেক বছর মে মাসে তিনি রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সংগীতের বড় অনুষ্ঠান পালন করছেন। তিনি সেই অনুষ্ঠানে একা দশটিরও বেশি রবীন্দ্র সংগীত গান। তাঁর ছাত্রছাত্রীরাও যোগদান করেন। তিনি অনেক রবীন্দ্র সংগীত জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাই তাঁর অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত বাংলায় এবং জাপানিতে গাওয়া হয়। তিনি কলকাতাতে মাঝে মাঝে শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

রবীন্দ্রানুরাগী আর একজন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী হচ্ছেন জাপান প্রবাসী কোরিয়ার মহিলা Mina Kang। তিনি ১৯৭৪ সালে বিশ্বভারতীতে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনৃত্য ও মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষা নিয়েছেন। তিনি জাপানে রবীন্দ্রনৃত্য শিক্ষার ক্লাশ নিয়ে রবীন্দ্রনৃত্যের অনেক জাপানি শিল্পীদের তৈরি করেছেন। তিনি জাপানের বিভিন্ন জায়গায় ও য়ুরোপের নানা দেশে নৃত্য-অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিক নৃত্য পছন্দ করেন।

Mina Kang এর রবীন্দ্রনৃত্যের সংস্থার তরফ থেকে জাপানি শিল্পীদের নিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে "শান্তিনিকেতন সন্ধান" শীর্ষক রবীন্দ্রনৃত্যের অনুষ্ঠান বিগত বছরে পাঁচবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেমন এই বছরে রবীন্দ্রনৃত্য অনুষ্ঠানে এই দশটা নাচ পরিবেশিত হয় :

(১) নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ,(২) নির্মল কান্ত নমো হে নমো ,(৩) দারুণ অগ্নিবাণে, (৪) হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, (৫) আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে, (৬) হিমের রাতে গগনের দীপ গুলিরে, (৭) শীতের হাওয়ার লাগল নাচন, (৮) ও গো কিশোর আজি তোমার, (৯) ওরে গৃহবাসী খোল্ দ্বার খোল্, (১০) ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে, (১১) আমার মল্লিকা বনে, (১২) বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা। আর জাপানের পশ্চিম অঞ্চলে Osaka, Kyoto ও Kobe তেও রবীন্দ্র নৃত্য ও রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান উদযাপিত হচ্ছে।

১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীতে ভারতের মধ্যে প্রথম জাপানি বিভাগ খোলা হয়। তার পর থেকে সাত জন জাপানি অধ্যাপক জাপানি ভাষা শেখান।

১৯৭১ সালে টোকিওতে ভারত-জাপান রবীন্দ্রসংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। সভাপতি Tsusho Byodo, সাধারণ সম্পাদক Kazuo Azuma। উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের আদর্শের ভিত্তিতে ভারত-জাপানের সাংস্কৃতিক বিনিময়। প্রত্যেক মাসে সভাতে রবীন্দ্রনাথের সময়ে বিশ্বভারতীর জাপানি অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিনিকেতনের নানা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সেখানে রবীন্দ্র পরিচয়, রবীন্দ্র সংগীত-নৃত্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি হত। শান্তিনিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠিয়ে দেওয়া হত।

ভারত-জাপান রবীন্দ্র সংস্থার পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীতে নিপ্পন ভবন স্থাপনের প্রস্তাব বিশ্বভারতীর তখনকার আচার্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল।

১৯৮৮ সালে জাপানে ভারত উৎসব পালিত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বিবিধ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। শান্তিদেব ঘোষ ও শর্মিলা রায় রবীন্দ্র সংগীত গেয়েছিলেন এবং জাপানে প্রথম রবীন্দ্রচিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। হাজার হাজার দর্শক দেখতে এসে অভিভূত হয়েছে। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এছাড়া রবীন্দ্র Symposium ও অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিমাইসাধন বসু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। সেই সময় তিনি বিশ্বভারতীর জাপানি প্রাক্তনীদের ও জাপানি রবীন্দ্রনুরাগীদের কাছে বিশ্বভারতীর নিপ্পন ভবন স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতার আহ্বান জানান। প্রথমে ভারত-জাপান রবীন্দ্র-সংস্থার সভাপতি Tsusho Byodo ও সাধারণ সম্পাদক Kazuo Azuma দুইজনেই ভারত-জাপান রবীন্দ্রসংস্থার তরফ থেকে নিপ্পন ভবনের পরিকল্পনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘাকাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে দুজনে আনন্দের সঙ্গে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং রবীন্দ্রনুরাগী সকলের কাছ বিশ্বভারতীর এই প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। তাঁরা সকলে এক হয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে "নিপ্পন ভবন সংগঠন সমিতি-জাপান" প্রতিষ্টা করা হল। সমিতির পক্ষ থেকে নিপ্পন ভবনের

বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ভারত-জাপানের গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়। সমিতির সভাপতি Tsusho Byodo, সাধারণ সম্পাদক কাজুও আজুমা, আর অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক Tatsuo Morimoto, অধ্যাপিকা সুবিখ্যাত চিত্রকর Fuku Akino, বিশ্ববিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ Hajime Nakamura, Kiitsu Sakakibara, Madam Tomi Kora প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিমাইসাধন বসু, অশীন দাশগুপ্ত, শিশির মুখোপাধ্যায় ও সব্যসাচী ভট্টাচার্য সকলেই এই নিপ্পন ভবন নির্মাণের জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও কর্মীদের সহযোগিতা নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বর্তমান উপাচার্য ডঃ দিলীপকুমার সিংহও আপ্রাণ সাহায্যে করে চলেছেন।

১৯৯১ সালে শিশির মুখোপাধ্যায় নিপ্পন ভবন ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। সভাপতি ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৯৩ সালের শেষে। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিপ্পন ভবন উদ্বোধন হয় উপাচার্য সব্যসাচী ভট্টাচার্যের আমলে। ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণ, দিল্লীস্থ জাপান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ও জাপানি অধ্যাপকেরাও অনুষ্ঠানে-মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

অন্য দিকে জাপানের নিপ্পন ভবন সংগঠন সমিতি বিশ্বভারতীর নিপ্পন ভবন নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন, নির্মাণ কার্যের সম্পুর্ণতা ও উদ্বোধন ইত্যাদি উপলক্ষে এবং রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে টোকিওস্থ ভারত-দূতাবাসে ভারতীয় রাষ্টদূত এবং জাপানের বিশিষ্টব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আনন্দ-সভা অনুষ্ঠান করেছে বারংবার। সেখানে অভিনন্দন ভাষণ, বক্তৃতা ও রবীন্দ্রনৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর নৃত্য শিল্পী যতীন্দ্রনাথ সিং, গায়ক প্রশান্তকুমার ঘোষ, গায়িকা ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদক দেবাশিস হাজরা ও নিপ্পন ভবনের অধ্যক্ষ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আহ্বানে এসে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

অন্যদিকে নিপ্পন ভবনের উদ্বোধনে পর বিশ্বভারতীর আহ্বানে Japan Foundationএর মাধ্যমে জাপানের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতরা বিশ্বভারতীতে এসে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গবেষকদের সঙ্গে গবেষণামূলক কাজ করছেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জোড়াসাঁকো ছিল বাংলার শিল্প আন্দোলন ও জাপানের নব শিল্প আন্দোলনের মিলন স্থান। বর্তমানে সেই সবের সন্ধানে জাপানি পণ্ডিত, শিল্পী ও ভারতশিল্প প্রেমীরা জোড়াসাঁকোয় মহা উৎসাহ নিয়ে যাচ্ছেন। এই নব কলাশিল্পের যোগাযোগের ব্যাপারে রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য পবিত্র সরকার এবং প্রাক্তন উপাচার্য রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বেশ অবদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নানামুখী প্রতিভা। জাপানিরা বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নানা ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে ভারত-জাপানের সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ক্রীড়াপ্রেমী কাজুও আজুমা

অচিন্ত্য সাহা

অধ্যাপক কাজুও আজুমার সাথে আমার প্রথম দেখা এই বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনে ১৯৭৯ সালে। প্রথম সাক্ষাতেই আমি অভিভূত, কারণ 'কনিচুয়ার' বদলে একজন জাপানির মুখে 'নমস্কার-আসুন' শুনে। তখনই বুঝেছিলাম যে আমি কবাডির দেবদূতের দেখা পেয়েছি। অনুভব করতে অসুবিধা হয়নি যে আজুমাসান কেবলমাত্র রবীন্দ্রভক্তই নন, তিনি মধুর বাংলা ছন্দ, তাল লয় ছাড়াও কলকাতাকে ভালবেসে ফেলেছেন। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার গান তাই তাকে বারবার টেনে নিয়ে আসে এই জনবহুল কলকাতা শহরে। উনি বলেন, 'এখানে প্রাণ আছে, তাই বারবার ছুটে আসি'। কবিগুরুর শান্তিনিকেতন, কলকাতা তথা ভারতের জন্য কিছু করতে তার মন সবসময় ব্যাকুল।

এই সুযোগ আমি কিছুতেই হাতছাড়া করিনি। ঘণ্টার ঘণ্টা, দিনের পর দিন কবাডি খেলা নিয়ে আলোচনা করেছি। উদ্দেশ্য জাপানের জাতীয় খেলা তথা এশিয়ার একমাত্র নিজস্ব খেলা জুডোকে অলিম্পিকে প্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে এসে যায় রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণ এবং জুডোর প্রতি তাঁর আসক্তির কথা। রবীন্দ্রনাথের কবাডি সম্বন্ধে একটি লেখা তাঁকে দেখাই। উনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাটি ছিল এই রকম :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন

'হাডুডুডু' বইখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এই খেলা পুনর্বার আমাদের দেশে প্রচার করিবার জন্য আপনারা যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হউক এই কামনা করি। আমাদের এখানকার ছাত্রদের মধ্যে এ খেলার যথেষ্ট আদর আছে। ইতি ২৬ মাঘ ১৩৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাবাডি খেলা জুডোর মতো এশিয়ান গেমে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি শুনে যদিও ভারতীয়দের অনেকে হাসাহাসি করেছিলেন, কিন্তু আজুমাসানকে বোঝাতে খুব অসুবিধা হয়নি যে সেটা সম্ভব, একমাত্র জাপানের সহযোগিতায়। লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে সফলতা আসতে বাধ্য। উনি বিদ্বান ব্যক্তি। ওনার ব্যক্তিত্ব এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় কবাডিকে পৌঁছে দিল জাপানে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। জাপানি ভাষায় কবাডির আইন উনি না লিখলে বা ওদের দেশের ছেলেমেয়েদের না বোঝালে, পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত এবং ধনী দেশের ছেলেমেয়েরা খালি পায়ে গায়ে মাটি মেখে কবাডি খেলবে ভাবা যেত না।

রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য, আজুমা সাহিত্য সংস্কৃতি এবং বিনোদন উপলক্ষে বাংলা থেকে অনেককেই

জাপানে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

১৯৮০ সালে প্রথমেই কবাডি কোচ ডঃ সুন্দররামকে কলকাতা হয়ে জাপানের ইচিকাওয়া শহরে পাঠানো সম্ভব হয় আজুমাসানেরই প্রচেষ্টায়। ওঁর পরিচিত মিঃ কামাগাতার বাড়ীতে একমাস থেকে ডক্টর রাম কবাডির প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট করে তোলেন। তারমধ্যে অন্যতম প্রয়াত সোজি হায়ানো, যিনি তখন টোগানে শহরের মেয়র ছিলেন। আজুমাসানের চেষ্টায় জাপান কবাডি অ্যাসোসিয়েশন তৈরী হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ভীষণ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য উনি এবং ওনার স্ত্রী কেইকো আজুমা যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। কারণ একথা সত্য জাপান কবাডি না খেললে অনেক দেশই কবাডি খেলতে এগিয়ে আসতো না। আর তা না হলে কবাডিও এশিয়ান গেম্‌সে কোনদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করত না।

১৯৮০ সালে ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় যে প্রথম এশিয়ান কবাডি হয় তাতে ওঁর চেষ্টায় জাপানি প্রতিনিধি মিঃ ম্যাকিনো যোগ দেন। তারপর ভারত পুরুষ এবং মহিলা দলের জাপান ভ্রমণ, জাপান দলের ভারত ভ্রমণ, ভারত থেকে কয়েকবার কবাডি কোচ নিয়ে যাওয়া, সবেতেই আজুমাসান ওঁর স্ত্রীর অবদান কবাডির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একসময় ওঁরা দুজনেই জাপান অ্যামেচার কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের ডিরেক্টর পদে কাজ করেন। শুধু তাই নয়, কেইকো আজুমার ভাই ইউচি কাসামাৎসু-র অবদানও ভুলবার নয়। উনিই প্রথম যিনি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে নিয়ে যান হিরোশিমা শহরে। শহরের মেয়র যিনি হিরোশিমা এশিয়ান গেমস অরগানাইজিং কমিটির কর্মকর্তা, তাঁর সঙ্গে কবাডির অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আলোচনার জন্য। আলোচনা ফলপ্রসু হয়।

১৯৯০ সালে কলকাতার ৩০০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক কবাডি প্রতিযোগিতা হয়। এতে জাপানের ছেলে এবং মেয়ের দল ছাড়াও মিসেস আজুমা এবং মিসেস হায়ানো যোগদান করেন। চায়না থেকেও বেইজিং এশিয়ান গেমস অরগানাইজিং কমিটির ডিরেক্টর এবং আরো কয়েকজন সদস্য কলকাতায় কবাডি খেলা দেখে অভিভূত হন। তখনই ঠিক হয় ১৯৯০ সালের বেইজিং এশিয়ান গেমসে কবাডি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৯৪ সালে হিরোশিমা এশিয়ান গেমস থেকে কবাডিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। জাপানিরা একবার না করলে হ্যাঁ করানো অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু বলতে বাধা নেই এই ব্যাপারেও আজুমাসানের অবদান এবং জাপান অ্যামেচার কবাডি এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ইশিবাশির প্রচেষ্টা এবং আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সার্থক হয়। হিরোশিমা এশিয়ান গেমস অরগানাইজিং কমিটির প্রতিনিধিরা কলকাতায় এসে আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেন যে ১৯৯৪ এর এশিয়ান গেমসে কবাডি থাকবে। এই চুক্তি যথাযথ রূপায়িত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় যে ১৯৯৮ সালে ব্যাংককে যে এশিয়ান গেমস হতে যাচ্ছে তাতে কবাডির স্থান নেই।

আজুমাসানও কবাডিকে জাপানে নিয়ে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় খেলাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে যে কষ্ট স্বীকার করছেন তা অতুলনীয়। তিনি যথার্থই একজন ক্রীড়াপ্রেমিক।

অর্ঘ

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

এক একজন মানুষ
যেন মূর্ত শান্তিনিকেতন
যেমন রবীন্দ্রনাথ
যেমন আপনি
কাজুও আজুমা
শালবীথির স্নিগ্ধ স্তব্ধতা
দেবদারুর প্রসন্নতা
কিংবা ছাতিমতলার
সুগন্ধ নির্জনতা
যেন শান্ত নম্র ধীর বাতাসের
চলফেরা
প্রাণের আরাম
অথচ আপনি চলেছেন
প্রজ্ঞার টানা বারান্দা ধরে
দূর নক্ষত্রলোকে
আর্ত জিজ্ঞাসা নির্জন শ্রমণ
ভূগোলের ভুল সীমানা
কখনো বাঁধতে পারে না
আপনাকে
পারেও নি
এখন জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রিতে
আমার মুগ্ধ কল্পনা
কোনো উপমা উৎপ্রেক্ষায়
আপনাকে ধরতে পারে না
অথচ আমাকে শান্তিনিকেতন
উপহার দিয়ে চলে যায়
বুদ্ধের মূর্তির মত
ধ্যান ও নিমগ্নতার
পায়ের কাছে রাখি
শ্রদ্ধাকুসুমের অর্ঘ

মৈত্রীর আলেখ্য

কল্যাণী কার্লেকর

মুখবন্ধ লিখেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র সরকার আর ভূমিকা লিখেছেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ও সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গ্রন্থটির অনুবাদক কাজুও আজুমা। বিংশ শতাব্দীতে জাপানে আধুনিক শিল্পকলার এক নতুন আন্দোলন হয়, তার নেতা তেনসিন ওকাকুরা সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের জন্য ভারতে ভ্রমণ করেন, কাম্পো আরাই তাঁর শিষ্য।

১৯১৬ সালে জাপানে ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইয়োকোই কোশির আঁকা 'অন্ধের সূর্যবন্দনা' ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তার একটি কপি চান, কাম্পো আরাই তা করে দেন এবং সেই সুত্রে কবি তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ করেন। পাশাপাশি জাপানের শিল্পীমহল থেকেও তাঁকে অজন্তার ছবি আঁকার জন্য ভারতে পাঠানোর প্রস্তাব হয়। এইভাবে দুই দেশের উদ্যোগে তিনি কলকাতায় আসেন। ১৯১৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় পৌঁছানোর পর থেকে, কলকাতায় জাপানের কনস্যুলেট জেনারেল মিৎসুই কোম্পানির আপিস ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মধ্যে ভাগাভাগি করে থাকেন ও দুই সুত্রে সংযোজনে ভারত ও জাপানের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সেতু রচনা করেন।

তাঁর কলকাতাবাসের প্রায় পুরো সময়টাই ঠাকুরবাড়ির ও তার সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট চিত্রকরদের আওতায় কেটেছে। তিনি অনেককে জাপানি প্রথায় ছবি আঁকতে শিখিয়েছেন, অনেককে ছবি উপহার দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এই ঠাকুর ভ্রাতৃত্রয় ছাড়া নন্দলাল বসু, সুরেন কর, মুকুল দে, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি চিত্রকরদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। আলোচ্য বইটিতে অসিতকুমারের আঁকা কয়েকটি ছবি রয়েছে। যখন জোড়াসাঁকোয় থাকতেন, তিনি প্রতিদিন ছবি আঁকা শেখাতেন। তাছাড়া, কলকাতার জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। ভারতের তখনকার লাটসাহেবকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতে দেখেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী সাতাত্তর বছর বয়সী এনি বেসাণ্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবের সময়ে উপাসনার পর পংক্তিভোজনে বসে পাত পেড়ে হাত দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন তাঁর যেমন নতুন, তেমনই ভাল লেগেছিল নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ করের সঙ্গে স্পিরিট বা 'ভূত' সম্বন্ধীয় আলোচনার পর, টেবিলে হাত রেখে ভূত আনার ব্যাপারকে তিনি 'আমার মানসিক চিন্তার প্রতিফলন' বলে ধরে নিয়েছিলেন।

জাদুঘরে গিয়ে পুরনো বুদ্ধমূর্তি ও অনেক ছবি দেখে অভিভূত হয়েছিলেন ও অনেক স্কেচ করেছিলেন। কলকাতার গঙ্গাতীরে অসংখ্য লোকের সূর্যবন্দনা ও গঙ্গাস্নান, তপস্বীদের ধ্যান, শীর্ষাসন ও লোহার পেরেকের ওপর শোওয়া ও তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। মেয়েদের সূর্যস্তব ও অনাবৃত দেহের সৌষ্ঠব তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কলকাতার

বাইরেও কতকগুলি জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে ট্রেনে বোলপুরে গিয়ে গরুর গাড়িতে ধুলোভরা পথ দিয়ে শান্তিনিকেতনের অরণ্য বিদ্যালয়ে যাওয়া, সেখানকার পৌষমেলা ও রাত্রিতে রবীন্দ্রনাথের আগমনে ছাত্রদের দ্বারা মশাল হাতে তাঁর অভ্যর্থনার কথা বর্ণনা করেছেন। স্থানীয় 'কালো জাতি' সাঁওতালদের লক্ষ্য করে তাঁদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ও স্কেচ করেছেন।

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে ট্রেনে নৈহাটি গিয়ে নৌকায় চড়ে গঙ্গায় বেড়িয়েছেন ও ঠাকুরদের প্রাসাদোপম বাড়িতে থেকেছেন। বস্তুত ঠাকুরদের বাড়িটি নৈহাটিতে নয়, চুঁচুড়ায়। কাম্পো আরাই সম্ভবত নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে গিয়ে সেখানেই ছিলেন। এর কিছুদিন পরে নন্দলাল বসুর সঙ্গে পুরী ও সেখান থেকে কোণারকে গিয়ে মন্দির ও মূর্তি দেখেছেন ও স্কেচ করেছেন। বাংলার মেয়েদের সঙ্গে ওড়িশার মেয়েদের আকৃতিগত পার্থক্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং যাবার পথে তরাইয়ের অরণ্য অঞ্চল ও সেখানকার দার্জিলিঙের জনসমাজে ভূটানি, নেপালি, তিব্বতি, ভারতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের লোকেদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করেছেন।

ছোট পাহাড়ের দেশ রাঁচিতে তিনি একদিকে সেখানকার অনার্য জাতের মানুষদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন, অন্যদিকে রাঁচি ক্লাবের অভিজাত সমাজের সঙ্গে মিশেছেন। ১৯১৮ সালে জাপানের নতুন কলাশিল্প কেন্দ্রের চিত্রকর সদস্য তেনসিন ওকাকুরাকে নিয়ে মুকুল দে ও নন্দলাল বসুর সঙ্গে অজন্তা গুহা দেখতে গিয়েছেন ও স্কেচ করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক ছবি আঁকার বিশেষজ্ঞ জাপানি চিত্রকর সেনরিন কুরিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মে মাস পর্যন্ত ছবি আঁকা, আঁকতে শেখানো, আঁকা ছবি বন্ধু ও পরিচিত চিত্রকরদের উপহার দেওয়ার ও প্রদর্শনী করার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে, জুন মাসে দেশে ফিরে গেছেন। এক অদ্ভুত ধর্মময়, কর্মময় দিনযাপনের পঞ্জি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজের জন্মদিনে আরাইকে যে কবিতা লিখে উপহার দিয়েছিলেন বইয়ের শেষে সেটি ছাপা হয়েছে :

শ্রীযুক্ত আরাই কাম্পো
বন্ধু,
একদিন অতিথির প্রায় এসেছিলে ঘরে,
আজ তুমি যাবার বেলায় এসেছ অন্তরে।

আজ সেই কবি নেই, সেই চিত্রকরও নেই, ছবি দেওয়া-নেওয়ার প্রায় কেউই বর্তমান নেই। বিশ্বকবি আছেন দেশের অন্তরে কিন্তু উদিত সূর্যের দেশের সেই অতিথির স্মৃতিচিহ্নগুলি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী, কলকাতার রবীন্দ্রভারতী, ভারতীয় জাদুঘর ও বিভিন্ন লোকের ঘরে থেকে কি স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ?

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'ভারত ভ্রমণ দিনপঞ্জি' (লেখক : কাম্পো আরাই; মূল জাপানি থেকে অনুবাদ : কাজুও আজমা) গ্রন্থের আলোচনা।

কলকাতার পত্রপত্রিকায় কাজুও আজুমা

রবীন্দ্রভারতীর ভিসুয়াল আর্টের ঘরে বসে যখন তিনি অনর্গল ঝরঝরে বাংলায় কথা বলছিলেন তখন তাঁকে মনে হচ্ছিল বাংলারই মানুষ। আসলে তা নন। প্রথমে তাঁর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল হয়তো কোনও প্রতিবেশী রাজ্যের বাসিন্দা। তাও নয়। তিনি একজন জাপানি। শুধুমাত্র এটুকুই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি ওই দেশের একজন বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষক। নাম প্রফেসর কাজুও আজুমা। বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকদিন ধরেই যুক্ত তিনি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিচর্চা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপকও ছিলেন। সাতষট্টি থেকে একাত্তর সাল অবধি। তারপর ফিরে গিয়েছিলেন স্বদেশে। ফিরলে কী হয় ? থেকে থেকেই বাংলা তাঁকে ডাকে। শান্তিনিকেতন। কলকাতা। গল্প করতে করতে জানালেন, বাংলার প্রতি তাঁর এই টানের কথা। সুযোগ পেলেই পাখা মেলেন পশ্চিমের আকাশে। কলকাতায় নেমে শান্তি। আজুমা এখন রেইতাকু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথ ও জাপান বিষয়ক গবেষণায় মগ্ন তিনি। দেশে বিদেশে অনেকেই সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন নতুন কিছু পাবেন বলে। সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তাঁর রবীন্দ্রচর্চার সাম্মানিক ডি-লিট উপাধি প্রদান করেছে। সেদিন অবশ্য তাঁকে শিল্প-ইতিহাস বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা গেল। তখনও অবশ্যই বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ। কথায় কথায় এক সময়ে বললেন, বাংলা ভাষা জানেন বলে তিনি গর্বিত। ছাপানো পরিচয় পত্র বা কার্ডের পিছনে সই করলেনও জাপানির পাশাপাশি বাংলায়।

কাজুও আজুমা ❑ কলকাতার কড়চা ❑ আনন্দবাজার পত্রিকা ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

Every time Dr Kazuo Azuma camps at Santiniketan — this is his 36th visit — the campus turns a little more cheerful. The grey-haired professor of Comparative Culture, Sanskrit and Bengali at the Reitaku University in Japan is seen moving around in a bicycle. He stops suddenly to say, *kamon achho* ? (How are you ?) to children passing by. He is no stranger to their parents either.

The sun-tanned,gracious and somewhat shy professor seemed comfortable in a relatively small room at Ratan Kuthi, the VIP guest house of Visva-Bharati. With files, papers, books, camera, tape recorder and a few huge suitcases strewn around, he appeared to be living in a luggage van.

Dr Azuma is accompanied by his wife, Mrs Keiko Azuma, who is a professor in the Bengali Department of the Eastern Institute in Tokyo.

It was March 10, 1945. About 1,00,000 people had died in Tokyo in a three-hour air raid by the Americans. Dr Azuma was 14 then. About 120 boys died in his school alone, the 65 year-old man recounted. "We collected

bodies and dumped them in makeshift graves. We had no food, no colthes. We lived on weds", he recalled.

He said it was not only a physical annihilation but also a spiritual crisis. Elderly people were seeking solace in temples. The boy was also groping in the dark. Suddently, he stumbled upon a Japanese tanslation of Rabindranath Tagore's Gitanjali.

"It shook me from head to foot like a volcanic tremor. Since then Tagore became the guiding star of my life", Dr Azuma said.

After he finished his M.A. in German, he took up Indian philosophy under Prof Hajime Nakamura, a renowned Indologyst. Later, he took up Bengali studies under yet another famous scholar and Tagorian Prof. Soko Watanabe, in the same university.

"Though I grappled with Tagore's works for 20 years, these did not fully unfold before me till I joined as a teacher of Japanese studies in Visva-Bharati in 1967", he said.

"We set up home in a cottage with our two daughers. I learnt to cook Bengali food along with the local dialect". Mrs Azuma recalled wistfully.

"Unless you live in a community, breath the air that envelops it, you never know the people, their culture and heritage"; Dr. Azuma interrupted.

He said his four-year stint at Santiniketan had helped in his quest for Tagore. Had he not been here, Tagore would have remained a distant star, far from fife's realites. Though Tagore died 26 years before he came here, the professor feels his presence every where in Santineketan.

Dr Azuma went back to Japan in 1971 at the end of his assignment but he left his soul in this red soil.

One could not but marvel his fluency in Bengali, during the course of the interview. Dr Azuma pulled this correspondent's leg as he liberally bleinded English with Bengali.

"Why do you mix up ? When you speak Bengali speak it like a Japanese", he quipped pointing towards himself.

Besides being well-versed in Sanskrit and Bengali, he knows Hindi, Oriya, Assamese, and Tamil. "Bengali is my second mother tongue", the Japanese boasted.

Dr. Azuma has the rare distiction of reading the complete works of Tagore in its original form thrice. He is giving it a fourth reading. "Each time I go through his lyrics, stories and essays, I find them new", he said.

At his home in Japan, the professor has set up a library of 10,000 Bengali books of which 400 are on Tagore. He loves to collect various editions of Tagore's books.

Since his return to Japan in 1971, Dr Azuma has been trying to project Tagore among the Japanese and is happy he has achieved "some success".

Gitanjali was translated in Japanese in 1915, after it won the Novel Prize. Through it was a translation of the English version and lacked the original flavour, it was the beginning of Tagore studies in Japan, Dr Azuma

explained.

Selected works of Tagore in Japanese translation are now available in 12 volumes of which Dr Azuma is the chief editor. He has translated *Gora*, *Char Adhyay*, *Muktadhara*, *Chandilika*, *Atmaparichay* and a host of other poems.

Rabindranath — his life and thought, written by Dr Azuma, is possibly the most comprehensive introduction to Tagore studies for Japanese scholars.

Though Tagore has been the focus of Japanese scholars, modern Bengali movelists like Tarashankar Bandopadhaya, Manik Bandopadhaya and Bibhutibhusan Bandopadhaya have entered the arena. Even Sunil Gangopadhaya could now be read in Japanese, he said.

A landmark in Dr Azuma's contribution to the studies of Indo-Japanese cultural exchange is the establishment of Nippan Bhavan in Santiniketan in Februay, 1994. He is the moving spirit behind the centre.

Tagore entralls Japanese scholar ❑ *Satya Sain* ❑ *The Statesman 31st August 1995*

সঙ্কলন : উত্থানপদ বিজলী

‘যেখানে সংকীর্ণতা সেখানে থাকতে পারবো না’

জাপানিদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেওয়া, ভারত-জাপানের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাস রচনা করা জীবনের মুখ্য কাজ। এখন জাপানের রেইতাকু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক। অধ্যাপনা করেছেন বিশ্ব-ভারতীতে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লীর লালবাহাদুর সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি। রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য রূপে তাঁকে বরণ করেছে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। জীবনের নানা ঘটনা, পুরানো দিনের কথা, বাংলার প্রতি তাঁর টানের কথা এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে জাপানের বিখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক, অধ্যাপক কাজুও আজুমা জানালেন ***তাপস অধিকারীকে।***

প্রঃ আপনার জন্ম কোথায় ? কোন শহরে ? কখন ?

উঃ জাপানে। টোকিও শহরে। ১৪ আগষ্ট ১৯৩১।

প্রঃ আপনার বাবার নাম ?

উঃ তেৎ সুও আজুমা (Tetsuo Azuma)। আজুমা নামের অর্থ হল আমার স্ত্রী।

প্রঃ কোথায় পড়েছেন ? কি নিয়ে পড়তেন ওখানে ?

উঃ ক্লাস সিক্স পর্যন্ত চিবা ইচিকাওয়াতে। তারপর নিম্নমাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক ৩বছর +৩বছর বিএ কোর্স চার বছর, এম এ (double) করেছি University of Tokyo থেকে। ভারতীয় দর্শন বিভাগে পড়েছি। জার্মান ভাষা ও সাহিত্য পড়েছি টোকিওতে। আমার বেশিরভাগ শিক্ষাই জাপানের রাজধানী টোকিওতে।

প্রঃ আপনার শৈশবের কথা কিছু বলুন। ঐ সময়ের কোনও স্মরণীয় ঘটনা ?

উঃ ছোটবেলা থেকে প্রকৃতির সঙ্গে খুব যোগাযোগ ছিল। মাছ ধরতাম। সাঁতার কাটতাম। গাছে উঠতাম। দূরে হেঁটে হেঁটে বেড়াতাম। তখন শহর তেমন গড়ে ওঠেনি। বাড়ি ছিল টোকিও শহর থেকে কিছুটা দূরে। গ্রাম না হলেও গ্রামের মত ছিল। পাশে নদী ছিল। টোকিওর ‘এদো’ নদী ছিল আমার বাড়ির খুব কাছে। ১২০ বছর আগে পর্যন্ত টোকিও-কে ‘এদো’ বলতো। নিরিবিলি ছিল। ব্যাঙ, পোকা, চিংড়ি মাছ আমরা ধরতাম। ছোটবেলার সেই সময় স্বর্গের মত ছিল। পোকা আমার খুব ভাল লাগে। নানা ধরনের পোকা, পাখি, ফুল আমার সঙ্গী ছিল। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত খুব ভালো ছিলাম। যুদ্ধের পর খুব খারাপ সময় কেটেছে। অনেকের টি-বি দেখা দিয়েছিল। অনেক লোক মারা গিয়েছিল। আমারও হয়েছিল। মুখ দিয়ে রক্ত বেরুত। রোজই বেরুত। বি এ কোর্স অবধি খুব কষ্ট পেয়েছি। আমি যখন নিম্নমাধ্যমিক ক্লাস সিক্স-এ পড়ি তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়। আমেরিকা থেকে আক্রমণ হল। মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার বোমা বর্ষণে টোকিওতে এক লক্ষ মানুষ মারা গেল। কাঠের বাড়ি ছিল। সব আগুন ধরে গেল। তখন আমার চোদ্দ বছর বয়স। আমার দিনটাও মনে আছে, ১৯৪৫ সালের মার্চ

মাসের ১০ তারিখ। আমাদের স্কুলে bombing হল। ওপর থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে আগুন নামে। ছাত্ররা ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারে না। আগুনে আর ধোঁয়ায় ১২০ জন মারা যায়। পরে আমরা মৃতদেহ সংগ্রহ করেছি। সে সময় ভাত ছিল না, গম ছিল না, নুন ছিল না। খাবারের খুব অসুবিধা হয়েছিল। পরে অসুখ নিয়ে অনেক কষ্টে পড়াশুনা করেছি। সত্যের সন্ধান এবং মনের শান্তি পাওয়ার জন্য ইণ্ডিয়ান ফিলোজফি পড়েছি। সে সময় আমার গুরু বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধতত্ত্ববিদ অধ্যাপক হাজিমে নাকামুরার সান্নিধ্যে আসি। তারপর Herman Hesse (হেরমান হেসে) এর উপন্যাস 'সিদ্ধার্থ' এর উপর Thesis লিখেছিলাম। আমি জার্মান ভাষা পড়তাম। ভারতীয় দর্শন না পড়লে কিছুই শিখতে পারতাম না।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে আপনি বহুবার এসেছেন, বিশেষ করে এই ভালবাসার শহর কলকাতাতেও, যাকে অনেকে মৃত নগরী বলে থাকে, আপনার কেমন লাগে কলকাতা ?

উঃ হৈ চৈ এর জায়গা বলে কলকাতা আমার খুব ভাল লাগে। কলকাতা জীবন্ত, সে জন্য ভাল লাগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের ফুটপাথে বইয়ের দোকান, কফিহাউস সবই আমার ভাল লাগে। কলেজস্ট্রীট এরিয়াটা আমার বড্ড ভালো লাগে। টোকিওতে এরকম বইয়ের দোকান আছে। দুদিকে এই মিল দেখে ভাল লাগে। এখন আমাদের ওখানে নাগরিক জীবনে বিচ্ছিন্নতা এসে গেছে। আত্মকেন্দ্রিকতা এসে গেছে। জাপানে সেই পরিবেশ পাই না। এখানে গান, নাটক, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি আমার ভাল লাগে। টোকিওতে এসব এখন আস্তে আস্তে কমে আসছে। কলকাতার এই সাংস্কৃতিক জীবন আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে কলকাতার মানুষ।

প্রঃ রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে আগ্রহী হলেন কিভাবে ?

উঃ রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংরেজি থেকে জাপানি ভাষায় অনূদিত 'গীতাঞ্জলি', 'ডাকঘর' 'রক্ত করবী' পড়ি ছেলেবেলার দিনগুলোয়। ছোটবেলা থেকেই মানুষ হয়েছি জাপানে। প্রকৃতিকে ভালবাসতাম খুব। রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রকৃতিকে পেতাম। কবিতা পড়তাম। এ সমস্ত গ্রন্থ পড়ে রবীন্দ্র সাহিত্যে আকৃষ্ট হই। আস্তে আস্তে ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়া শুরু করলাম। সে সময়কার রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ প্রবীণ অনুবাদকের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত Dr. Shoko Watanabe (সোকো ওয়াতানাবে)। তিনি সংস্কৃত, পালি, চীনা,গ্রিক, রুশ, ইংরেজি, ফরাসি, বাংলা ও আরও কিছু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র মূল বাংলা থেকে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। Watanabe সাহেব বললেন, তোমরা মূল বাংলাভাষা থেকে পড়বে, তাহলে আরও ভাল জানতে পারবে। Watanabe সাহেবের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠের রেকর্ড 'হে মোর চিত্ত পূর্ণ্য তীর্থে...' শুনে, সেদিন থেকে বাংলা ভাষার ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এই কারণে বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় জাপানের Publishing House থেকে

প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর নির্বাচিত খণ্ডের 'Personality' গ্রন্থটি আমি ইংরেজি থেকে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করি।

প্রঃ প্রাথমিকভাবে বাংলা শিখেছেন কোথায় ?

উঃ সে সময় বাংলা ভাষা শেখার কোন ব্যবস্থা জাপানে ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানি ছাত্রদের কাছ থেকে কথাবার্তা শিখেছি। Dr. Shoko Watanabe এর কাছ থেকে ব্যাকরণ শিখেছি। পূর্ব পাকিস্তানি ছাত্রদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শহীদুল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, আব্দুল হাই প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতজনের সঙ্গে চিঠি পত্রের মাধ্যমে জটিল বিষয়গুলির সমাধান পেয়েছিলাম।

প্রঃ বাংলা ভাষায় সাহিত্যকর্মে আপনি একজন কিংবদন্তি নাম, আপনার বাংলা ভাষার প্রতি এই আগ্রহ আর ভালবাসার আসল কারণটা কি ?

উঃ রবীন্দ্রনাথের জন্য বাংলা ভাষা শিখেছি। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তাম। অনেকে বলতেন, মূল বাংলা থেকে পড়লে আরও ভালো হয়। Indian Philosophy থেকেই বাংলা ভাষা শুরু করি। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে জানার উৎসাহে বাংলা শেখা শুরু করি। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে মনে হল বাংলা ভাষা মধুর ভাষা। ছন্দ চমৎকার। পরে জানতে পারলাম যে অনেক রকম ছন্দ আছে। মিষ্টি মনে হলো। ব্যাকরণ আরও ভাল ভাবে শিখবো। আমি সংস্কৃত ভাষা শিখেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রকাশ করেছি। এটি জাপান-ভারত সাংস্কৃতিক সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ দেখে তাঁকে ছন্দগুরু বলা যায়। ভাবের সাথে ছন্দের মিল। বাংলা ভাষার মধ্যে সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলতার আভাস পাওয়া যায়। বাংলাভাষা ও গ্রাম্য ভাষাকে আরও জানার জন্য পশ্চিমবাংলার ১০০-১৫০টি গ্রাম ঘুরেছি। পুকুরে স্নান করতাম। খড়ের বাড়িতে শুতাম। বাঙালি রান্না খেতাম। বাঙালি রান্না ভালো লাগে। গ্রামের লোকের কাছ থেকে আত্মীয়তা পাওয়ার পর বাংলাকে একটুও ভুলতে পারিনি। গ্রামের লোকের কাছে যেমন বাংলার বুদ্ধিজীবীর কাছে তেমনই আমি সমান ঋণী। ঠিক যেন আমার ছোটবেলার জাপানের সেই গ্রাম। এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রঃ আপনার সাহিত্য জীবনের প্রেরণা কে ? এই জীবন সম্পর্কে বলুন ?

উঃ যুদ্ধের সময় যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেই জীবন দর্শন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মাধ্যমে যে দর্শন পাওয়া যায় তা নিকট বলে আমার মনে হয়। প্রেরণা বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথই প্রেরণা। জাপানি সাহিত্যের মধ্যে মৌলিক idea কম। আবেগ বেশি। রবীন্দ্রসাহিত্যে দর্শন, আত্মচিন্তা, বিষয় ভাবনা পাওয়া যায়। গভীর ভাবে উৎসাহ পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ থেকে। জার্মানি লেখক Holderlin এর সাহিত্য আমার খুব ভাল লেগেছে। সাহিত্যের গবেষক এবং অনুবাদক আমি। আমি কবি নই, গল্পকার নই। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গ্যেটেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতেন। বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করি গ্যেটের সাহিত্য কর্মকে। 'রবীন্দ্রনাথ ও জার্মানী' প্রবন্ধ লিখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ

বলেছিলেন, সত্যতার সাথে সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের সাথে আইনস্টাইনের সংলাপ, মানবতার শ্রেষ্ঠতম যুগ। দ্বাদশ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলীতে আমার গবেষণাধর্মী যে লেখা আছে তার মধ্যে এটি একটি।

প্রঃ সাহিত্য ছাড়াও আপনার ভাললাগার তালিকাটি কি রকম ?

উঃ প্রকৃতি ভাল লাগে। গাছপালা, পোকা, পাখি খুব ভালো লাগে। জাপানের পাখি দেখতে একটু অন্যরকম। শান্তিনিকেতনে এসবই আমি পাই, তাই ওখানে খুব যাই। পোকা আমার বিশেষ প্রিয়। সাইক্লিং ভাল লাগে। অনেকদূর পর্যন্ত সাইকেল চালাতে ভাল লাগে। দৌড়তে পারতাম। কবাডি খেলা ভাল লাগে। আন্তর্জাতিক কবাডি খেলায় রেফারি হয়েছিলাম জাপানে। জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছিলাম Rules on Kabadi। বই পড়তে খুব ভালবাসি। ভাষা শিখতে ভাল লাগে। এখন সাঁওতাল ভাষা শিখছি।

প্রঃ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেলেন কি ভাবে ?

উঃ Associate Professor রূপে জার্মান ভাষা পড়াতাম জাপানের Yokohama National University তে। জার্মান ভাষার অধ্যাপক হিসেবে এখানে পাঁচ বছর কাজ করেছি। বিশ্বভারতীর জাপানি বিভাগের অধ্যাপক তাৎসুও মোরিমোতো (Tatsuo Morimoto) আমাকে বলেছিলেন, জাপানি চর্চার অধ্যাপক হয়ে পরবর্তী কালে আসবো কিনা, শান্তিনিকেতন থেকে ডাক এলো। জার্মানভাষা পড়াতাম। সে সময় বাংলা ভাষা জানার আগ্রহ আরও বাড়লো। অক্টোবর ১৯৬৭তে আনন্দচিত্তে শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীতে ছুটে গেলাম। সাড়ে তিন বছর ছিলাম।

প্রঃ বিশ্বভারতীর 'জাপানি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে' অধ্যাপনার বিগত দিনগুলির কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে !

উঃ শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ছিল। এটাই আনন্দ। মাঝে মাঝে জাপানি সংস্কৃতি সন্ধ্যা,জাপানি সঙ্গীতের সন্ধ্যা, জাপানি জুডো সন্ধ্যা, চা পার্টি অনুষ্ঠান, এরকম নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছি। উপাচার্য ছিলেন কালিদাস ভট্টাচার্য। সে সময় আমার স্ত্রী শান্তিনিকেতনে এসে বাংলা শিখেছে। বি এ, এম এ করেছে জাপান থেকে। আমার স্ত্রী আর আমি বাংলায় কথা বলি। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় আমরা প্রথম বাঙালিদের মত বাঙালি রান্না হাত দিয়ে খেতাম। অনেকের বাড়িতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছি। রাসবিহারী বসুর স্ত্রীর মাসতুতো বোন বীণার মত (আমরা 'কোতো' বলি) একটি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে, শেখানোর জন্য। আমার স্ত্রী জাপান থেকে তার এনে সেই বাজনা নিপ্পন ভবন ১৯৯৪এ উদ্বোধনের সময় বাজিয়েছিল।

প্রঃ বহু বছর ধরে আপনি শান্তিনিকেতনে আসছেন, এখনও আসছেন, পূর্বের সেই আকর্ষণ কি এখনও বোধ করেন সমান ভাবে ?

উঃ প্রকৃতির সৌন্দর্য একই রকম। তখন পাঁচিল ঘেরা ছিল না। এখন পাঁচিল ঘেরা হয়েছে। আমাদের সময় আরও মুক্ত ছিল বলে মনে হয়। এখন লোকসংখ্যা বেশি

হয়েছে। কিছুটা আভাস পাই। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি। বাড়িঘর বেশি। তবুও অন্য জায়গার তুলনায় শান্তিনিকেতন এখনও খোলামেলা পরিবেশ। গাছপালা বেশি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ জায়গা। আস্তে আস্তে জমিজমার সংকীর্ণতা, এ কোন দোষ নয়। একই পরিবেশ পেতে গেলে আরও গ্রামে গ্রামে যেতে হয়।

প্রঃ নতুন লেখার কথা এই মুহূর্তে কি ভাবছেন ?

জাপানিদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেওয়া অনুবাদের মাধ্যমে। বক্তৃতার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে ভারত জাপানের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাস বাংলায় রচনা করা। কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। আবার কিছু প্রকাশ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ পাঁচবার জাপানে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত অনেক জায়গা আছে। অনেকে এখনও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন। যে সব প্রবীণ জাপানি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আমি গিয়ে গিয়ে সংগ্রহ করছি। গত তিরিশ বছর ধরে এই কাজ করছি। যাদের কাছে যাচ্ছি তারা বেশির ভাগই ৯০ বছর বা তার চেয়েও বেশি বয়স। এই গবেষণার কাজ এখন আস্তে আস্তে প্রকাশ শুরু করেছি। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২ খণ্ডে জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সাত হাজার পৃষ্ঠার এই কাজ। গোরা, আত্মপরিচয়, কিছু প্রবন্ধ এবং কবিতা অনুবাদ করেছি।

প্রঃ আপনার অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা কি রকম ?

উঃ 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করেছি। এখনও গ্রন্থ হয়ে বেরোয়নি। গ্রন্থ আকারে তো সব নেই। অনেক অনুবাদ করেছি। ছড়িয়ে আছে। সেজন্য গ্রন্থের সংখ্যা বলা মুশকিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর বিশেষজ্ঞরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেমন শহীদুল্লাহ সাহেব, মুনীর চৌধুরী, আব্দুল হাই, এনামুল হক। সে সব বক্তৃতার সংকলন জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছিলাম।

প্রঃ প্রথম যখন আপনি এখানে আসেন তখন থেকে এখন পর্যন্ত কোন কোন ব্যক্তিত্বের সাথে আপনার যোগাযোগ গড়ে ওঠে ?

উঃ বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রভারতীতে পণ্ডিতদের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল। সকলকেই আমার গুরু মনে হত। শান্তিনিকেতনে তারাশঙ্করবাবুর বক্তৃতা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গেলাম সেই সময়। অনেকবার গিয়েছি। সত্যজিৎ রায়ের কাছে কয়েকবার গিয়েছি। চিত্রকরদের স্থান জোড়াসাঁকো এবং শান্তিনিকেতন। এদের কাছেও গেলাম। ও সি গাঙ্গুলীর তখন ৯০ বছর বয়স। প্রবোধচন্দ্র সেন, ভুদেব চৌধুরী, পুলিনবিহারী সেন, নীলিমা সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ, জয়ন্ত চক্রবর্তী, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দীপককুমার বড়ুয়া, রামবহাল তেওয়ারি, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইসাধন বসু, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পূর্ণদাস বাউল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, অশীন দাশগুপ্ত, প্রশান্তকুমার পাল, অজিতকুমার ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে নানা সূত্রে যোগাযোগ হয়েছে।

প্রঃ জাপানকে আমরা জানি আয়তনে খুবই ছোট অথচ সমগ্র পৃথিবীতে জাপান বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সব চেয়ে সেরা। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

উঃ পাহাড় বেশি। তামা নেই। লোহা নেই। কাঁচামাল নেই। খাটতে হয় খুব। না খাটলে বেঁচে থাকতে পারা যায় না। বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যাপারে আমি বলতে পারবো না। তবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নত হলেও পরিবেশ দূষিত হয়েছে। হাওয়া, জল খারাপ হয়। প্রকৃতির সাথে মানুষের সমন্বয় সৃষ্টি সর্বনাশও হতে পারে।

প্রঃ নিজের দেশের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে খুবই শ্রদ্ধাশীল জাপানের মানুষজন এ বিষয়ে জাপানের খুবই সুনাম আছে। আধুনিক জাপানের যুবক যুবতীরা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতটা আগ্রহী ?

উঃ ঐতিহ্যগত দিক বজায় রাখে, এটা ঠিক। জাতীয়তাবাদ অতিরিক্ত হলে খুব খারাপ। ছবি আঁকা, সঙ্গীত প্রেম, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বেড়েছে। ভারতের দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে বলে আমার মনে হচ্ছে। জাপানে এখন কিছু কিছু বাঙলা সাহিত্য অনুবাদ হচ্ছে। তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণের সাহিত্য অনুবাদ হচ্ছে। লোকসাহিত্যেও অনেকে আগ্রহী হচ্ছে। জাপানে এখন বাংলা ভাষাপ্রেমী প্রায় ১০০ জন। তখন তো ছিলাম মাত্র দু'তিন জন। জাপানের ছেলে-মেয়েরা ভারতকে আদর্শভূমি বলে মনে করে।

প্রঃ কিছুদিন আগে আমরা জেনেছি জাপানের কুড়ি জোড়া যুবক-যুবতী ভারতীয় প্রথায় বিয়ে করলেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

উঃ তাই না কি ! শুনে ভাল লাগলো। আমি জানতাম না।

প্রঃ ভারত-জাপান সংস্কৃতি বিনিময়ের এই চর্চা অব্যাহত রাখতে পারেন এ রকম কি কেউ তৈরি হচ্ছেন ?

উঃ জাপানের মধ্যে এটা খুব কম। ভারতের অনেকেই আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'মিলাবে মিলিবে যাবেনা ফিরে', সাংস্কৃতিক বিনিময় না থাকলে কোনও দেশই বাঁচতে পারবে না। এটা না থাকলে বাঁচতে পারা যাবে না। জাপান ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে খুব ঋণী। জাপানের চিন্তাধারায় ভারতীয় ভাবধারা এখনও রয়েছে। গোচরে অগোচরে।

প্রঃ বিশ্বভারতীতে নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিছু বলুন।

উঃ অনেকদিন আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এখানে নিপ্পন ভবন হোক। ১৯৮৮ সালে চিত্র প্রদর্শনী হল। উপাচার্য নিমাইসাধন বসু প্রাক্তন ছাত্রদের বললেন, উভয় দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্র গড়ে উঠুক। সমিতি তৈরি করে দানের মাধ্যমে নিপ্পন ভবন তৈরি হল ১৯৯৪ তে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সম্মতি পেলাম।

প্রঃ জাপানের 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিনিময় সংস্থা'টির কাজকর্ম ও পরিকল্পনা কি ?

উঃ সর্বজনীন মানবতাবাদ। তার ভিত্তিতে এটা করা। সাহিত্যের মধ্যে নানান চিন্তাধারা রয়েছে। একসঙ্গে মুক্ত আলোচনা করা যায়। সাহিত্যের বিনিময়ে সাহিত্যের সমৃদ্ধি হয়। Ideaর আদান প্রদান হয়। দুবার হয়েছিল জাপানে। দিল্লী এবং কলকাতায় হয়েছে। বাংলাদেশে হবে, চীনেও হবে। কলকাতায় ও জাপানে এ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপকুমার সিংহ, পবিত্র সরকার, শ্যামসিং শশী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আহমদ রফিক, কবির চৌধুরী, আশিস সান্যাল প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবিকে।

প্রঃ বাংলাদেশে আপনি গেছেন, আমরা জানি, বাংলাদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

উঃ বাংলাদেশে কবি সম্মেলনে গিয়ে দেখি, উৎসাহ উদ্দীপনা, মেতে ওঠা, এসব খুব ভালো লাগে। বাংলাদেশের দশজন কবি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করছেন। বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক কবিতা, আঞ্চলিক ভাষার সংগ্রহ, এসব কাজ খুব দ্রুত চলছে। বাংলাদেশের উপভাষার বৈচিত্র খুব সুন্দর। যশোরের ভাষা খুব সুন্দর। ওদের উৎসাহ খুব। চট্টগ্রামের ভাষাও বুঝতে পারি।

প্রঃ বাংলাদেশে কোন কোন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব এবং গবেষকের সাথে আপনার যোগাযোগ হয়েছে ?

উঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনীর চৌধুরী, ডঃ শহীদুল্লাহ, কবীর চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, রফিক আজাদ, আহমদ রফিক, আব্দুল হাই প্রমুখ।

প্রঃ এখানকার বর্তমান বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার মতামত ?

উঃ রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ার পর বিশেষ কিছু পড়ার সুযোগ পাইনা। যুবকদের কবিতা পড়েছি, পড়ি। শিশুসাহিত্য পড়েছি। শিশুসাহিত্য ভাল হচ্ছে। যৌথ পরিবার আস্তে আস্তে ভেঙে আসছে। সমস্যা আসছে। এসব আধুনিক সাহিত্যে উপন্যাসে কিছু কিছু প্রতিফলিত হচ্ছে। গভীরভাবে আত্মসমালোচনাও রয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার সমাধান করা যাবে কিনা এসব পাওয়া যাচ্ছে। বাঙালি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নানান দিকে প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ করে ছড়া আমার খুব ভাল লাগে। আমার ছাত্ররাও খুব ছড়া লেখে। ছড়ায় symbolism আছে। ঠাট্টা আছে। জীবন আছে। নানান দিকের বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যের স্রোত থামে না। প্রবাহমান হতে থাকে।

প্রঃ আমরা একটা ব্যাপার দেখেছি, আপনি কলকাতায় থাকতে খুব ভালবাসেন এর কারণ কি ? বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ আগেই বলেছি। কলকাতায় হৈ চৈ আছে। প্রাণ আছে। কলকাতা আমার ভাল লাগে। নানা জাতি নানা প্রাণ নানা দেশের এমন মিলন অন্য কোথাও দেখা যায় না। সংকীর্ণতা কম। আমাদের বিদেশির পক্ষে এটা খুব ভাল লাগে। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় আমার থাকতে ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথ কোনও ধর্মকে অবিশ্বাস করেননি বলে আমার মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে মানুষের বাইরে এবং অন্তরে সমান তা রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছেন। এখানে স্কুল আছে। গুজরাতি, মুসলিম, শিখ, বিভিন্ন দেশের ছেলে মেয়ে একত্র

হয়। আমার এটা খুব ভাল লাগে। এসব ব্যক্তিগত পছন্দ এবং সম্বন্ধ। সব ধর্মের মধ্যেই গুণ আছে। আমার জন্মগত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। একে অন্যকে বুঝতে হবে। সকলে মানুষ তো। আন্তরিকতা দরকার। ধর্মপাল মহাথেরর মধ্যে ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। অনেক বছরের সম্বন্ধ। অনেক জাপানিই এখানে আসে। হেমেন্দু সান যে তথ্যভিত্তিক কাজ করেন তা আমার খুব ভাল লাগে। শিক্ষিকারা, ছোট ভাই-বোনেরা আমাকে খুব ভালবাসে। শান্তিনিকেতনের জাপানি ছাত্রছাত্রী বেশিরভাগই এখানে আসে। এখানে থাকার কোন ভয় নেই। চুরি নেই। অনেকের সাথে দেখা করতে পারি। যেখানে সংকীর্ণতা সেখানে থাকতে পারবো না।

প্রঃ আপনার ছেলে মেয়ে সম্বন্ধে জানতে চাই। তারা কি বাংলা জানেন ? বাংলা চর্চা করেন ?

উঃ আমার দুই মেয়ে। দুই ছেলে। মেয়ে দুজন শান্তিনিকেতনে ছিল কিছুকাল। বড় মেয়ের বয়স থখন পাঁচ বছর, আর ছোটমেয়ের এক বছর। ওরা একটু একটু বাংলা জানে। কিছু কিছু বলতে ও বুঝতে পারে। বাংলা জানার আগ্রহ আছে। আমার বড় ছেলেকে 'নবকুমার' নাম দিয়েছেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। ছেলেদের মধ্যে বাংলার প্রতি আগ্রহ তেমন নেই। একটু একটু জানে। ছেলেরা অর্থশাস্ত্রের দিকে গেছে। আমার স্ত্রী ভাল বাংলা জানে। বাংলা পড়ে।

প্রঃ এই মুহূর্তে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জাপানি ছেলেমেয়েরা কি রকম পড়াশুনা করছেন ? বিশ্বভারতীতে এর সংখ্যা কত ?

উঃ মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, বেনারস, দিল্লী, যাদবপুর, কলকাতা, বিশ্বভারতী, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বিশ্বভারতীতে বিদ্যাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, বিনয় ভবনে কুড়ি জনের বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

প্রঃ আমরা যারা ভারতীয় তরুণ, আমাদের প্রতি আপনার আহ্বান কি ?

উঃ ভারতের বিভিন্ন জায়গা দেখেছি। বাঙালিদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ঝোঁক সবচেয়ে বেশি। সাহিত্যিকও অনেক বেশি। সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে বাঙালির ঐতিহ্য থাকবে। বাঙালির আবেগ বেশি। জাপানিদের মধ্যে আবেগ থাকলেও চেপে রাখার প্রবণতা বেশি। আপনারা প্রকাশ করতে জানেন। সেদিক থেকে প্রবীণ ও নবীনদের কোনও তফাৎ নেই। সকলেই একরকম মনে হচ্ছে। এখানে আবৃত্তির সভা হয়। লোক আসে। জাপানে এসব চিন্তার বাইরে। একটাই কথা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র মতন, সব সময়ে এগোতে থাকুন। রবীন্দ্রনাথের মতন। যাঁর কলম থামতো না। বলাকা আমার খুব প্রিয়। আপনাদেরও প্রিয় হোক।

জাপানে বাংলা সাহিত্যচর্চা

কাজুও আজুমা

সময় ও কর্মের বিভিন্নমুখী পট পরিবর্তনের গুরুত্বকে সুস্পষ্ট ভাবে মূল্যায়ন করে জাপানে বাংলা সাহিত্যচর্চার ও গবেষণার ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে গেলে সমগ্র ইতিহাসের চালচিত্রকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি জাপানে কিভাবে ঘটলো তার মূল ইতিহাস।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এসেছে গবেষণা ও চর্চার ক্ষেত্র।

তৃতীয় পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের উত্তরণের নবযুগের ইতিহাস যা বর্তমানকে ছুঁয়ে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীরও ব্যাখ্যা পাঠকদের মাঝে তুলে ধরে।

প্রথম পর্যায় ১৯১৪ সাল থেকে আরম্ভ হয়ে এই শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত ব্যাপ্ত। দ্বিতীয় পর্যায় রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর সময় থেকে প্রায় দশ বছর। তৃতীয় পর্যায় এই শতকের সপ্তম দশক থেকে এখন পর্যন্ত।

জাপানে বাংলা ভাষা চর্চার যে ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমেই; তাই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন বাংলা লেখকের চর্চা বা গবেষণার ক্ষেত্র সঙ্গত কারণেই সৃষ্টি হয়নি। তৃতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রচর্চা আরও গভীরভাবে অগ্রসর হয়েছে, তথাপি এ পর্যায় থেকে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অনেক লেখক ও কবিদের পরিচয় ও কর্ম নিয়ে চর্চা ও গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ এ পর্যায় থেকে বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নব ধারায় নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

তাই বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে গেলে জাপানে রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাস সর্ব প্রথমে গুরুত্ব সহকারে অনুসন্ধান করা দরকার। এই ইতিহাস আলোচনায় জাপানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ আত্মিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা আশা করি পাঠক সমাজ সহজে অনুধাবন করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯০২ সালে। ৩১মে ১৯১৬ সালে তিনি সর্বপ্রথম জাপান ভ্রমণে আসেন। তিনি জাপানে ভ্রমণের সময়ে অধিকাংশ সময়ই হাজার বিঘার বাগান বাড়িতে ছিলেন। সে বাড়ির মালিক তোমিতারো হারা ছিলেন চিত্রকরদের ধনী অভিভাবক। রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকেই রোজ কবিতা লিখতেন এবং বক্তৃতার খসড়া তৈরি করতেন। রবীন্দ্রনাথ তারপরও আরো চারবার জাপান ভ্রমণে আসেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভ্রমণের সময়ে দোভাষীর কাজ করেছিলেন ম্যাডাম কোরা। জাপানি চিন্তাবিদ এবং কলা-শিল্পের নেতা ও সমালোচক তেন্‌সিন ওকাকুরা

(Tenshin Okakura) ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে বেলুড় মঠে যান। সেখান থেকে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যান। জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার প্রথম পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে ওকাকুরা সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্যে শিতোকু হোরিকে (Shitoku Hori) শান্তিনিকেতনে পাঠান। হোরি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের প্রথম বিদেশী ছাত্র। ১৯০৩ সালে ওকাকুরার শিষ্য বিখ্যাত জাপানি চিত্রকর সুন্‌সু হিসিদা (Shunso Hishida) এবং তাইকান ইহকোয়ামা (Taikan Yokoyama) সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে এবং জোড়াসাঁকোতে আসেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অসিত হালদার ও অন্যান্যদের মধ্যে চিত্র শিক্ষার আদান প্রদান আরম্ভ হয়।

তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে চিত্রকর শোকিন কাৎসুতা (Shokin Katsuta) (১৯০৫-১৯০৮) এবং কামপো আরাই (Kampo Arai) (১৯১৬-১৯১৮) শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাঁকোতে চিত্রাংকন শিক্ষা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানের জিন্‌নোসুকে সানু-কে (Ginnosuke Sano) (১৯০৫-১৯০৮) এবং শিন্‌জো তাকাগাকি-কে (Shinzo Takagaki) (১৯২৯- ১৯৩১) শান্তিনিকেতনে Judo-র অধ্যাপক রূপে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁদের বাঙালি শিষ্য-শিষ্যাগণ এখনো শান্তিনিকেতন থেকে তাঁদের স্মরণ করছেন। তাকাগাকি কলকাতাতে তখনকার কলকাতার মেয়র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সামনে Judo প্রদর্শন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে জাপান ভ্রমণের সময় রাসবিহারী বসুর সঙ্গে আলোচনা করে রাসবিহারী বসুর স্ত্রীর মাসতুতো বোন মাকিকো হোসি-কে (Makiku Hoshi) ফুল সাজানো শিক্ষার জন্যে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শ্রীমতী হোসি ১৯০৩ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁর শিষ্যা কয়েকজন এখনো শান্তিনিকেতনে রয়েছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় জাপানি ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই সংস্কৃত, নৃত্য, সংগীত এবং কলাশিল্প শিক্ষার জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনিময়ের এক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্মী, শিক্ষক ও ছাত্রদের জাপানে পাঠিয়েছিলেন, জাপানের কলাশিল্প ও কাঠের কাজ শেখার জন্য। এইভাবে বিশ্বভারতী এবং জাপানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে গভীর সাংস্কৃতিক আদান প্রদান শুরু হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে দু'বার অর্থাৎ সর্বমোট ৫বার জাপান ভ্রমণের মাধ্যমে জাপান সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জাপানিদের সৌন্দর্যবোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবোধ, আধ্যাত্মিকতা, পরিশ্রমশীলতা, হাতের কাজের সূক্ষ্ম নিপুণতা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অপরদিকে তিনি জাপানের অতিরিক্ত সামরিক বাদ, বাণিজ্যিক বাদ, যান্ত্রিকতার তীব্র সমালোচনা করেন। তবে তিনি সর্বোপরি জাপানিদের ও জাপানি সংস্কৃতিকে খুব

ভালোবেসে ছিলেন। বিশ্বভারতীতে নিপ্পন ভবন স্থাপন করার জন্যে তিনি তখনকার জাপানি ছাত্র সুসো বিয়োদোকে (Tsusho Byodo) উৎসাহ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সে প্রত্যাশা ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাস্তবায়িত হয়েছে। নয় দশকের মধ্যে শান্তিনিকেতনের জাপানি প্রাক্তন অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দেড় শতাধিক। রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতে শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির এসব আদান-প্রদানের ধারা চলে এসেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা স্রোত এখনো বহমান।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানিদের যোগসূত্র তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রায় এক যুগ পূর্ব থেকে। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০২ সাল থেকে রবীন্দ্রনাধের সঙ্গে জাপানের এবং বহু জাপানির ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নোবেল পুরস্কার পাওয়া পর্যন্ত জাপানের রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৪ সাল থেকে জাপানে রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা তথা অনুবাদ আরম্ভ হয়।

তারপর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ হয়েছে। তার মধ্যে ছিল Gitanjali, Gardener, Crescent Moon, Post Office, King of Dark Chamber, Stray Bird, Sacrifice, এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত নানা ছোটগল্প ও কবিতা বহুবার ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও ভাষণও অনূদিত হয়েছে, যেমন Realisation of Life; The Message of India to Japan, Nationalism on Oriental Culture and Japanese Mission, Creative Unity ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমতী Tomikora ১৯১৬ সালে ছাত্রী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার পর ১৯২৪ সালে ও ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণের সময় দোভাষীর কাজ করেন। আমেরিকাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অন্যদিকে তিনি ইংরেজি Philosophy of Leisure ও Gitanjali জাপানি ভাষাতে অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত পুস্তকমালায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি অশেষ সন্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রানুরাগী একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরূপে রূপে তিনি জাপানে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদগুলি জাপানি ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ হয়।

১৯১৪ থেকে এই সময় পর্যন্ত জাপানে বাংলা সাহিত্যের চর্চার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখার পরিচয় ও অনুবাদ হয়েছিল এবং রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কীয় সমালোচনা প্রবন্ধও লেখা হয়েছে। তবে সেগুলো গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছিলো না, কারণ সে সময় অনুবাদগুলি মূল বাংলা ভাষা থেকে করা হয়নি। শুধু জিন্‌নোসুকে

সানো, যিনি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সাল অবধি শান্তিনিকেতনে Judo ও জাপানি ভাষা শেখাতেন, তিনি গোরা-র মূল বাংলা পুস্তক এবং ইংরেজি অনুবাদ মিলিয়ে দেখে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ পর্যায়ে কোন জাপানি বাংলাভাষা শেখার উদ্দেশ্যে ভারতে যাননি। সেইজন্য মূল বাংলা ভাষা থেকে রবীন্দ্রচর্চা সে সময়ে হয়নি। তাই বাংলা সাহিত্য থেকে কোন অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

জাপানে বাংলা সাহিত্যচর্চার দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ বছর। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব এ সময় জাপানেও হয়েছিলো। সে উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অনেক ইংরেজি লেখা এবং ইংরেজি অনুবাদ থেকে জাপানি ভাষায় অনেক কিছু অনুবাদ করা হয়। Apollon প্রকাশনী থেকে ৭ খণ্ডের রবীন্দ্র রচনাবলী জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এখানে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাপারে আর আলোচনা করবো না। কেননা, এ পর্যায়ে রবীন্দ্রচর্চা, গবেষণা ও অনুবাদের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়।

সর্বপ্রথম মূল বাংলা ভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন সোকো ওয়াতানাবে (Shoko Uatanabe) , তিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রায় ৩০টি ভাষার পারদর্শী। এরপর কিজোইনাজু (Kizoinazu) এবং সন্দীপ ঠাকুর যুগ্মভাবে রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রী' মূল বাংলা ভাষা থেকে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। এর ফলশ্রুতিতে জাপানিদের মধ্যে বাংলা ভাষা শেখার উৎসাহ বেড়ে যায়। এসময় নোরিহিকো উচিদা (Norihiko Uchida) ও সুয়োশি নারা (Tsuyoshi Nara) বাংলা ভাষার ভাষাতত্ত্ব শেখার জন্যে চট্টগ্রাম ও কলকাতায় গিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষা শিখে বাংলাভাষায় ভাষাতত্ত্ব গবেষণার কাজ সমাপ্ত করে Ph.D. ডিগ্রি অর্জন করেন। আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি অনুবাদ করি এবং মূল বাংলা ভাষায় চণ্ডালিকা, মুক্তধারা ও নটীর পূজা পড়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখি। এ পর্যায়ে বাংলা ভাষাচর্চা পূর্ণাঙ্গরূপে শুরু হয়। তবে উল্লেখ্য যে তখনো রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যিকের সাহিত্য-কর্ম জাপানি ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

জাপানে বাংলা সাহিত্যচর্চার তৃতীয় পর্যায় ১৯৭০ থেকে অদ্যাবধি বিদ্যমান। এ পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যচর্চার আমূল বিবর্তন ঘটে। এসময়ে অনেক জাপানি বাংলা ভাষা শেখার জন্যে বাংলাদেশে, কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে যায়। এবারে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা নয়, বাংলা ভাষাচর্চার জন্যে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠে। তাই সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, নৃবিদ্যা ও সংগীত অর্থাৎ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা ও গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়। বাংলাভাষার ভাষাতত্ত্বের ব্যাপারে সুয়োশি নারা (Tsuyoshi Nara) ও তোমিও মিজুকামি (Tomio Mizokami) উল্লেখযোগ্য কাজ করেন এবং বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাপারে সেইজো আওয়াগি (Seizo Aoyagi) কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

মূল বাংলা ভাষা থেকে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ, পরিচয় ও গবেষণা এ পর্যায়ে অনেকখানি এগিয়ে যায়। সিজুকা ইয়ামামুরো (Shizuka Yamamuro), হিরোশি নোমা (Hiroshi Noma), তাৎসুও মোরিমতো (Tatsuo Morimoto) এবং আমার নিজের যৌথ সম্পাদনায় ১২ খণ্ডে সাত হাজার পৃষ্ঠার রবীন্দ্র রচনাবলী জাপানি ভাষায় Daisan Bumme (দাইসান বুম্মে) প্রকাশনালয় থেকে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এই রচনাবলীর প্রথম পরিকল্পনা ১৯৭৫ সালে করা হয়েছিল। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার ১২ বছর পরে বাকি সব খণ্ড সমাপ্ত হয়। এই রচনাবলীর তিন পঞ্চমাংশ মূল বাংলা ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই ত্রিশ বছরের মধ্যে জাপানে বাংলা ভাষা জানা লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রকাশনা কর্মকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে আখ্যায়িত করা যায়। উক্ত রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডটি হল গবেষণা খণ্ড। দেশী বিদেশী নানা গবেষকদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধগুলিও এর অন্তর্ভূক্ত। বাংলা সাহিত্যের ওপরে বিভিন্ন আলোচনা সমৃদ্ধ জাপানি ভাষার পত্রিকা 'কল্যাণী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই পর্যন্ত কল্যাণীর ২১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। জাপানি ভাষায় 'সোকা' নামক এ ধরনের আর একটি পত্রিকা রয়েছে। এপর্যন্ত এই পত্রিকাটির অনেকগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এখানেও আছে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ও অনুবাদ। এ দুটো পত্রিকার লেখক সকলেই বাংলা ভাষা ভালোভাবে জানেন।

তৃতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকেও বিভিন্ন বাংলা লেখকের পরিচয় রয়েছে। সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোকপাত করছি।

সুওশি নারা-র (Tsuyoshi Nara) অনুবাদ — সেঁজুতি, আকাশ প্রদীপ, নবজাতক, দালিয়া, বুদ্ধদেব, সাহিত্য, জাভা যাত্রীর পত্র, চিঠিপত্র। মাসাইউকি উনিশি-র (Masayuki Onishi) অনুবাদ — শিশুতীর্থ, নষ্টনীড়, মণিহার, খাতা, রবিবার, তাসের দেশ, ল্যাবরেটরি, ডাকঘর, চঞ্চলা, দান, মুক্তি, ছবি, শাজাহান, প্রশ্ন, আমি, ঘরে বাইরে। মাসাইউকি উসুদার (Masayuki Usuda) অনুবাদ — জীবিত ও মৃত। তামুৎসু নাগাই-এর (Tamotsu Nagai) অনুবাদ — দুঃসময়, ফুলের ইতিহাস, কল্যাণী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, সমুদ্রের প্রতি, কণ্টকের কথা, অচলস্মৃতি, ক্ষুদ্র আমি, কাগজ নৌকা, স্বপ্ন, ধূলামন্দির প্রভৃতি। তোমিও মিজোকামি-র (Tomio Mizokami) অনুবাদ — শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মাস্টারমশায়, তপস্বিনী, সংস্কার, মধ্যবর্তিনী। কাজুয়ে ইয়ানাগিসাওয়া-র (Kazue Yanagiswa) অনুবাদ — ওইখানে, মা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি। কাজুহিরো ওয়াতানাবে-এর (Kazuhiro Watanabe) অনুবাদ — দৃষ্টিদান। সাইজি মাকিনো-এর (Saiji Makino) অনুবাদ — দুর্বুদ্ধি, নামঞ্জুর গল্প, বলাই। সুংইয়া কাসুগাই-এর (Shunya Kasugai) অনুবাদ — স্ত্রীর পত্র, চিত্রকর, বদনাম। সেইজো আওইয়াগি-এর (Seizo Ayoagi) অনুবাদ — মুসলমানির গল্প। কোজি সাদাইয়ে-র (Kogi Sadaie) অনুবাদ

— শেষের রাত্রি, পাত্র ও পাত্রী। কাজুমারা হানাওয়া-র (Kazumaro Hanawa) অনুবাদ — অপরিচিতা। ইয়ায়েনাকাদা-র অনুবাদ — আশ্রমের শিক্ষা। আতোকো নোমা-র (Atoko Nama) অনুবাদ — প্রতিবেশিনী, রাসমণির ছেলে, দিদি। কিকুকো সুজুকির (Kikuko Suzuki) অনুবাদ — ঠাকুরদা। নাওকি নিশিওকা-র (Naoki Nishiko) অনুবাদ — রবিবার তোমোকো কাম্‌বে-র (Tomoko Kambe) অনুবাদ — স্বতন্ত্র গ্রন্থ 'শিশু' (৬৪টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত ৩০০ পৃষ্ঠা) রবীন্দ্র সংগীতের কয়েকটি গান।

কেইকো আজুমা-র (Keiko Azma) অনুবাদ — গল্পসল্প।

কাজুও আজুমা-র (Kazuo Azuma) অনুবাদ — পুনশ্চ, প্রান্তিক, গোরা, চার অধ্যায়, আত্মপরিচয়, চিঠিপত্র, জীবন দেবতা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকার কয়েকটি কবিতা, সভ্যতার সংকট, শেষলেখা, পত্রপুটের কয়েকটি কবিতা, আমার সোনার বাংলা, জনগণমনঅধিনায়ক, আশ্রম-সংগীত, গীতবিতানের কয়েকটি গান। Tsuyoshi Nara ও Masayuki Onishi-র যৌথ অনুবাদ — চতুরঙ্গ। তাৎসু মরিমোতোর (Tatsuo Morimoto) অনুবাদ — প্রথম পর্যায়ের কবিতা ও গ্রন্থগুলি এবং পূরবী, রোগশয্যায়, আরোগ্য, শেষলেখা, কবিতা গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতাগুলি; দুই বোন, নটীর পূজা।

এবারে রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রবন্ধ : Daisan Bumme প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ডে (রবীন্দ্র গবেষণা খণ্ডে) বাংলা ভাষা ভিত্তিক প্রবন্ধ লিখেছেন Kyoko Niwa, Tsuyashi Nara, Masayuki Usuda, Kazuo Azuma। বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, অজিতকুমার ঘোষ, অশ্রুকুমার সিকদার, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হায়াৎ মামুদ, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, রামবহাল তেওয়ারী, আরতি মুখোপাধ্যায়, প্রকাশকুমার নন্দী, স্বপনপ্রসন্ন রায়। সেগুলির জাপানি অনুবাদক হচ্ছেন Kazumaro Hanawa (কাজুমারো হানাওয়া), Kazuhiro Watanabe (কাজুহিরো ওয়াতানাবে), Tsuyoshi Nara (সুয়োশি নারা), Naoki Nishioka (নাওকি নিশিওকা), Keiko Azuma (কেইকো আজুমা), Kyoko Niwa (কিওকো নিওয়া)।

আমি রবীন্দ্রনাথের গবেষণামূলক পঞ্চাশখানা প্রবন্ধ লিখেছি ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন ও ভাবধারা বিষয়ে ৩৯০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রকাশ করেছি।

Masayuki Usuda, Naoki Nishioka ও আমি যুগ্মভাবে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র চিত্রকলা : রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা' গ্রন্থটি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছি। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যে Tsuyoshi Nara-র সম্পাদনায় Computer দ্বারা রবীন্দ্র শব্দকোষ দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে জাপানে বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় পর্যায় শুরু। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অনেক লেখকের পরিচিতি, চর্চা ও গবেষণা বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

Kyoko Niwa কর্তৃক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প সংস্করণের অনুবাদ

— ডাইনীর বাঁশি, আখড়াইয়ের দীঘি, ঘাসের ফুল, নারী ও নাগিনী, খড়গ, মালাচন্দন, রায়বাড়ি, জলসাঘর, ইত্যাদি একত্রিত করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ 'জলসাঘর' নামে প্রকাশিত হয়।

Kyoko Niwaর অনুবাদ — সুকুমার রায়ের মধ্য রাতের ভয়ঙ্কর, অবাক জলপান, আশ্চর্য ছবি, লোলির পাহারা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা সমগ্র থেকে সাতটি কবিতা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সমগ্রের মধ্যে থেকে চারটি কবিতা। এছাড়া তিনি কাজী নজরুল ইসলামের ৩৬টি কবিতা অনুবাদ করেছেন।

Masayuki Usuda-এর অনুবাদ জীবনানন্দ দাশের ৬১টি কবিতা অন্তর্ভূক্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থ পরিচয়সহ ১৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর ঘুমের গান, জীবনানন্দ দাশের হায় চিল, নির্জন স্বাক্ষর, কমলালেবু, আট বছর আগের একদিন।

তামোৎসু নাগাই-র (Tamotsu Nagai) অনুবাদ — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে, জীবনানন্দ দাসের বনলতা সেন, নির্মলেন্দু গুণের মানুষ, লজ্জা, রোদ উঠলেই সোনা, প্রথম অতিথি; প্রেমেন্দ্র মিত্রের নীল দিন, বুদ্ধদেব বসুর কোনো মৃত্যুর প্রতি, সমরেশ বসুর অবাধ্য, পসারিণী; সমর সেনের বিস্মৃতি, বিরহ।

তুসিইউকি ইয়ামাদা-র (Toshiyuki Yamada) অনুবাদ — বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টন।

Kazuhiro Watahabe-এর অনুবাদ — বুদ্ধদেব বসুর আড্ড্র, Hiroko Yamada-র অনুবাদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বীতংস, Kikuko Suzuki-র অনুবাদ যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামপ্রসাদ, দীনেশচন্দ্র সেনের ময়মনসিংহ গীতিকা, কেই সিরাই-এর (Kei Shirai) অনুবাদ আল মাহমুদের কাল নৌকা।

মেগুমি মায়েমুরার (Megumi Maemura) অনুবাদ — আসাদ চৌধুরীর গ্রাম বাংলার গল্প। শঙ্খ ঘোষ-এর ছড়া 'সব কিছুতেই খেলনা হয়'।

মারিকো উচিয়ামার-র (Mariko Uchiyama) অনুবাদ — সত্যজিৎ রায়ের গল্প সমূহকে একত্রিত করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। গল্প সমূহের মধ্যে রয়েছে, খগম; পটলবাবু, ফিল্ম স্টার, রতনবাবু আর সেই লোকটা, অতিথি, বাদুড়, বিভীষিকা, শিবু আর রাক্ষসের কথা, ব্রাউন সাহেবের বাড়ী, বারীণ ভৌমিকের ব্যারাম। উপেন্দ্রকিশের রায়চৌধুরীর টুনটুনির বই-এর অনুবাদ হয়েছে।

Masayuki Onishi-এর অনুবাদ সতেন্দ্রনাথ দত্তের পাল্কীর গান, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের না, জীবনানন্দ দাশের হাওয়ার রাত, মহাশ্বেতা দেবীর নুন, বাংলাদেশের কবি শামসুর রাহমান আবুল হাসান, শহীদ কাদরীর কয়েকটি অনুবাদ। এছাড়াও আমিও নজরুল ইসলামের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছি। কেইকো আজুমা স্বর্ণকুমারী সহ বিভিন্ন মহিলা লেখিকার কর্মও পরিচিতির উপর গবেষণা ধর্মী কাজ করেছেন।

Tomio Mizokami শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি লেখা অনুবাদ করেছেন। বিগত বিশ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষার পরিচয়, অনুবাদ, গবেষণা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

নানা স্থানে বাংলা ভাষার উপর পড়াশুনা হচ্ছে। রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছে।

নাওকি নিশিওকা Naoki Nishioka বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাংলার লোক কাহিনী তার উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করে জাপানি ভাষায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ আকারে প্রকাশের জন্য কাজ করছেন।

অপরদিকে জাপানিরা বাংলাভাষায় জাপানি সাহিত্যের অনুবাদের কাজও পাশাপাশি গুরুত্ব সহকারে চালিয়ে যাচ্ছেন।

Kyoko Niwa জাপানি হাইকু কবিতা (৩১ মাত্রার ছোট কবিতা) শ্রেষ্ঠকবি বাসো-র বিখ্যাত গ্রন্থ (Oku No Hosomichi) বাংলার অনুবাদ করেছেন। আমি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত জাপানি ঔপন্যাসিক ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা-র উপন্যাস 'ইন্দ্রধনু' (Niji) অনুবাদ করেছি যা ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

টোকিও থেকে প্রকাশিত অবয়ব-এর সম্পাদক ও কবি এম.এইচ. কবীরের একটি ত্রিভাষী স্বতন্ত্র কবিতা গ্রন্থ (বাংলা, ইংরেজি, জাপানি) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত কবিতা গ্রন্থের জাপানি অনুবাদক হচ্ছেন Toyokazu Nakata, Kyoko Niwa, Kazuhiro Watanabe, Tomoko Kambe, Keizi Takeuchi, Masayuki Usuda, Kazuo Azuma, Magumi Maemura, Yuka Okuda, Keiko Azuma, ইংরেজি অনুবাদকরা হচ্ছেন Kabir Chowdhury, Mohammad Nurul Huda, Syed Manzoorul Islam, Abedin Quader.

বাংলাদেশ থেকে বেলাল চৌধুরী সম্পাদিত, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে জাপানি গল্পের বাংলা অনুবাদ জলের ভিতরে চাঁদ ও অন্যান্য জাপানি গল্প। এছাড়াও জাপানে Tokyo University of Foreign Studies ও Tokai University তে Kyoko Niwa; Osaka University of Foreign Studies এ Tomio Mizokami; Reitaku Universityতে Kazuo Azuma এবং The Eastern Institute-এ Keiko Azuma বাংলা ভাষা পড়াচ্ছেন।

সুদীর্ঘ সময়ে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জাপানি সাহিত্যের বিনিময় সম্বন্ধীয় দীর্ঘকালীন কর্ম ও গবেষণা কার্যাদি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিচ্ছিন্নভাবে হয়ে এসেছে। সাহিত্যচর্চা ও গবেষণা কর্মে নিবেদিত প্রতিটি মূল্যবান ব্যক্তিসত্তা ও বিভিন্নভাবে অগ্রসরমান কর্ম-উদ্যোগকে সম্প্রতি একত্রীকরণের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে আরও বৃহৎ মাপের নানাবিধ কর্ম ও গবেষণার কাজ চালানোর বহুমুখী প্রত্যাশাকে সন্মুখে রেখে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ টোকিওতে প্রথমবার 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিনিময় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথিরা ছিলেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশিস স্যানাল, রফিক আজাদ, হায়াৎ মামুদ, কাজুকো শিরাইশি, কিওকো নিওয়া প্রমুখ। টোকিও থেকে প্রকাশিত বাংলা মাসিক পত্রিকা 'অবয়ব'-এর প্রথম

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'বাংলা ও জাপানি সাহিত্য বিনিময় সম্মেলন' নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর ভারত, বাংলাদেশ ও জাপানি সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মত বিনিময় ও আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিনিময় সম্মেলন'ও অনুষ্ঠিত হয়েছে জাপানে গত ২৮ মে ১৯৯৫ সালে। আর তৃতীয় 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিনিময় সম্মেলন' সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতের দিল্লী ও কলকতায় (১৩-১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫)। এতে আলোচ্য বিষয় ছিল — 'একুশ শতকে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' এবং 'বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা, ১৯৯৬ থেকে প্রতি বছর অন্যান্য দেশে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

'অবয়ব' সম্পাদক এম.এইচ. কবীর ও আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এ নব পদক্ষেপ অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্য বিনিময়ের ক্ষেত্রেই শুধু নয় বিশ্বব্যাপী মানবতার সংকটের মুহূর্তেও সচেতন ও সংবেদনশীল বিবেকের যথাযথ ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে পালন করতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী। অপরদিকে এই নবীন সংস্থাটি প্রতিটি দেশের সাহিত্যাঙ্গনে নিবেদিত কর্মীদের মাঝে এক আন্তরিক সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। সাহিত্যানুরাগী তরুণ জাপানিরাও তাদের আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখে আগামীতে স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়ে তা যথাযথভাবে পালন করবে এ বিশ্বাস আমার তাদের প্রতি রয়েছে।

কাজুও আজুমা-র রচনা : কালানুক্রমিক তালিকা

ক. *পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনা*

১. Uber die Sprache und Weisheit der Inder (On Language and Wisdom of Indians), in Japanese, Tokyo, 1960

২. Anmerkungen und Erlautungen von Hermann Hesses 'Unterbrochene Schulstunde' (Notes and Interpretations on Hermann Hesse's 'Interrupted School-hours') in Japanese, Tokyo, 1963

৩. 'On Bengali Phonemes, Bengal Language, Bengal & Bengal Literatue,' in Japanese, with Seizo Aoyagi, Tokyo, 1964

৪. Hermann Hesse's "Demian — War and Natural Mysticism", in Japanese, Yokohama, 1964

৫. 'On Tagore's আত্মপরিচয়', in Japanese, Tokyo, 1965

৬. 'On Tagore's চণ্ডালিকা', in Japanese, Tokyo 1965

৭. 'On Tagore's মুক্তধারা, in Japanese, Tokyo, 1966

৮. On Tagore's নটীর পূজা, in Japanese, Tokyo, 1967

৯. 'প্রাচ্য ঔপন্যাসিক' in Bengali, with Amitra Sudhan Bhatthacharya দেশ পত্রিকা, 1968

১০. 'ইন্দ্রধনু' ভূমিকা in Bengali, with Amitra Sudhan Bhatthacharya দেশ পত্রিকা, 1969

১১. জাপানি সাংবাদিকের চোখে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ in Bengali with Amitra Sudhan Bhatthacharya দেশ পত্রিকা, 1970

১২. Notes on German Translation of Tagore's 'Sadhana', in Japanese, Tokyo, 1971

১৩. 'Tagore and Bangladesh', in Japanese, Tokyo, 1971

১৪. 'Bengal Renaissance and Nandalal Bose', in Japanese, Tokyo, 1972

১৫. 'Modern Ethical Thought of Tagore', in Japanese, Tokyo, 1972

১৬. 'People and Life in Bengal', in Japanese, Tokyo, 1972

১৭. 'On Bengal Buddhist Association, in Japanese, Tokyo, 1972

১৮. 'My Criticism on Japanese Passive Attitude towards Cultural Intercourse with Asian Countries', in Japanese, Tokyo, 1972

১৯. Book Review on Tatsuo Morimoto's 'The History of the Independence of India', in Japanese, Tokyo, 1972
২০. 'On the Modern History of Cultural Interchange between India and Japan', in Japanese, Tokyo, 1973
২১. 'Tagore and Buddha', in Japanese, Tokyo, 1973
২২. 'Cultural Interchange between India and Germany', Tokyo, 1974
২৩. 'On Nazrul Islam' in Japanese, Tokyo, 1974
২৪. 'Modern Indian Art and Kampo Arai,' in Japanese, Tokyo, 1974
২৫. 'আধুনিক ভারত-জাপান সংস্কৃতি বিনিময়ের ইতিহাস,' in Bengali, 1975
২৬. 'On the Idea of Dharma of Tagore', in Japanese, Tokyo, 1975
২৭. 'On Bengali Literature', in Japanese, Tokyo, 1975
২৮. 'The Mind of India', in Japanese, Tokyo, 1976
২৯. 'Tagore and Gandhi', in Japanese, Tokyo, 1976
৩০. 'Indian Culture in Asia', in Japanese, Tokyo, 1976
৩১. 'Flowers and Rabindranath Tagore', in Japanese, Tokyo, 1976
৩২. 'Hymn to the River Ganges', in Japanese, Tokyo, 1977
৩৩. Bibliographical Review of Debendranath Tagore's 'আত্মপরিচয়' and Dinabandhu Mitra's 'নীল দর্পণ' in Japanese, Tokyo, 1977
৩৪. On Debendranath's 'আত্মচরিত' in Japanese, Tokyo, 1977
৩৫. On Ambedkar's "Bauddhadharma hi manavadharma hai", in Japanese, Tokyo, 1977
৩৬. 'Development of the Basic Theory of the Studies of Language and Culture,' in Japanese, Tokyo, 1978
৩৭. 'Mother Tongue Nationalism in Bangladesh', in Japanese, Tokyo, 1981
৩৮. 'Bibliographical Review of Tagore's Storeis', in Japanese, Tokyo, 1981
৩৯. 'Bengali Calendar,' in Japanese, Tokyo, 1981
৪০. 'On the Genealogy of Tagore's Family', in Japanese, Tokyo, 1981
৪১. 'Bibliographical Review of Tagore's 'গোরা' ' in Japanese, Tokyo, 1982
৪২. 'How to Translate from Bengali into Japanese in case of my Translation of 'গোরা', in Japanese, Tokyo, 1983

৪৩. 'The Festival of Goddess Durga', in Japanese, Tokyo, 1984

৪৪. 'Bangla sanskritik o bhasatattvik itihaser dristite Rammohan Rayer gauriya byakaran I-1,' in Japanese, Chiba, 1984

৪৫. 'Bangla sanskrtik o bhasatattvik itihaser dristite Rammohan Rayer gauriya byakaran I-2,' in Japanese, Chiba, 1984

৪৬. 'Modern Buddhism in Bangladesh', in Japanese, Tokyo, 1984

৪৭. 'Modern India and Her Children', in Japanese, Tokyo, 1984

৪৮. 'Bangla sanskrtik o bhasatattvik itihaser dristite Rammohan Rayer gauriya byakran, I-III,' in Japanese, Chiba, 1985

৪৯. 'On Savatthi', in Japanese, Tokyo, 1985

৫০. 'On Harsavardhana', in Japanese, Tokyo, 1985

৫১. 'Ramakrisna', in Japanese, Tokyo, 1985

৫২. 'The World of Poet Tagore', in Japanese, Tokyo, 1986

৫৩. 'Tagore and His thought of the Religion of Man', in Japanese, Tokyo, 1986

৫৪. 'Bibliographical Review of Neo-Buddhism', in Japanese, Tokyo, 1987

৫৫. 'On Prosody of Gitanjali' (I), in Japanese, Chiba, 1988

৫৬. 'Tagore and Bangladesh', in Japanese, Tokyo, 1988

৫৭. 'Educationalist....Tagore', in Japanese, Tokyo, 1988

৫৮. 'Bibliographical Review of Tagore's "Letters and Diaries", in Japanese, Tokyo, 1988

৫৯. 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ', আলপনা পত্রিকা, in Bengali, Tokyo, 1988

৬০. 'On Prosody of Gitanjali' (II), in Japanese, Chiba, 1989

৬১. 'On Prosody of Gitanjali' (III), in Japanese, Chiba, 1990

৬২. 'On Prosody of Gitanjali' (IV), in Japanese, Chiba, 1991

৬৩. 'Ajanta Fresco....Horyuji-Temple Fresco...Kampo Arai', in Japanese, Tokyo, 1991

৬৪. 'জাপানে রবীন্দ্রনাথ', in Bengali, কোরক পত্রিকা, Calcutta, 1991

৬৫. 'জাপানে রবীন্দ্রনাথ', in Bengali, লেখা পত্রিকা, Dhaka, 1991

৬৬. 'Diary of a Japanese Girl by Shizuyo Irie', in English, Delhi, 1992

৬৭. 'On Prosody of Gitanjali' (V), in Japanese, Chiba, 1992

৬৮. 'ভারত জাপানের সেতু আর কিমুরা', in Bengali, Calcutta, 1992

৬৯. 'On Prosody of Gitanjali' (VI), in Japanese, Kyoto, 1993

৭০. 'On Prosody of Gitanjali' (VII), in Japanese, Chiba, 1993

৭১. 'Tagore as a World Thinker', in Japanese, Tokyo, 1993

৭২. 'Tagore and Germany', in Japanese, Tokyo, 1993

৭৩. 'List of Works of Rabindranath Tagore', in Bengali, English and Japanese, Tokyo, 1993

৭৪. 'Barsapanji of Tagore', in Japanese, Tokyo, 1993

৭৫. 'Bamsalata of Tagore Family,' in Japanese, Tokyo, 1993

৭৬. 'The Characteristics of Tagore's Poems', in Japanese, Tokyo, 1993

৭৭. 'On Prosody of Gitanjali' (VIII), in Japanese, Chiba, 1994

৭৮. 'জাপানে বাংলা সাহিত্যচর্চা', in Japanese, Chiba, 1994

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ও রাহুল সান্নিধ্যে ভারততত্ত্ববিদ ব্যোদো in Bengali, মহাপন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৯৪

৮০. 'On Prosody of Gitanjali' (IX), in Japanese, Chiba, 1995

৮১. 'Tagore Family and Teushin, Taikan and Shunso', in Japanese, Tokyo, 1995

৮২. 'The World of Tagore', in Japanese, Kagawa, 1995

৮৩. 'Japan being Internationalized and South Asia', in Japanese, Tokyo, 1995

৮৪. 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী : শিজুএ ইরের চোখে' in Bengali, Calcutta, 1995

৮৫. 'রবীন্দ্রনাথ ও তিন জাপানী মহিলা' in Bengali, Calcutta 1995

৮৬. 'On Prosody of Gitanjali' (X), in Japanese, Tokyo, 1996

৮৭. 'On Indian Languages' in Japanese, Tokyo, 1996

খ. অনুবাদ

১. Translation of Tagore's 'Personality' with Hajime Nakamura from English into Japanese, Tokyo, 1961

২. Translation of Yasunari Kawabata's (Niji) 'ইন্দ্রধনু' with Amitra Sudhan Bhattacharya from Japanese into Bengali, 'দেশ' পত্রিকা, Calcutta, 1969

৩. Translation of আশ্রম সংগীত 'আমাদের শান্তিনিকেতন' from Bengali into Japanese, 1972

৪. Translation of H. Hoffman's 'Das Mensohenbild des indischen religiosen Genies' (The Human-Images of Religious Geneses of India), from German into Japanese, Tokyo, 1979

৫. Translation of "Tagore's Ideals of Education, The Educational Mission of the Visva-Bharati', from English into Japanese, Tokyo, 1981

৬. Translation of Some poems of 'নৈবেদ্য', from Bengali into Japanese, Tokyo, 1981

১৩ সকল গর্ব দূর করি দিব,....

১৪ তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে....

২৩ আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে....

৬৬ এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা....

৭০ তোমার ন্যায়ের দন্ড প্রত্যেকের করে...

৭. Translation of some poems of 'গীতাঞ্জলি', from Bengali into Japanese, Tokyo, 1981

৫ অন্তর মম বিকশিত করো....

৬ প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে....

৮ আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়....

১০৬ হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে....

১০৭ যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন...

১০৮ হে মোর দুর্ভাগ্য দেশ, যাদের করেছ অপমান,....

৮. Translation of a Poem of 'গীতালি' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1981

১৮ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ।....

৯. Translation of some poems of 'বলাকা' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1981

২ এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো...

৭ এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,....

৮ হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল...

৩৬ সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা...

৪৫ পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি....

১০. Translation of a poem of 'পত্রপুট', from Bengali into Japanese, Tokyo, 1981

১৫ তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি....

১১. Translation of some songs of 'গীতবিতান' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1981

মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে...আজি বর্ষারাতের শেষে

১২. Translation of 'চণ্ডালিকা' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1982

১৩. Translation of some poems of 'পুনশ্চ' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1984 'কোপাই', 'নূতন কাল', 'শেষ দান'

১৪. Translation of some poems of 'শেষ সপ্তক' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1984

১ স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,....

৭ অনেক হাজার বছরের...

২৪ আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে...

৩৪ পথিক আমি। পথ চলতে চলতে দেখেছি...

৪৩ পঁচিশে বৈশাখ চলেছে....

১৫. Translation of some poems of 'প্রান্তিক' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1984

১ বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল...

৮ রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা,...

১৪ যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়...

১৮ নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,...

১৬. Translation of 'চার অধ্যায়' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1985

১৭. Translation of 'আত্মপরিচয়' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1987

১৮. Translation of Tagore's some 'চিঠিপত্র' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1988

১৯ Translation of Dharmapal Mahathera's 'মহাবোধি সোসাইটির শতাব্দী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ', from Bengali into Japanese, Tokyo, 1992

২০. Translation of জাতীয় সংগীত (ভারত ও বাংলাদেশ) from Bengali into Japanese, Tokyo, 1992

জনগণমন - অধিনায়ক জয় হে...

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

২১. Translation of Amitra Sudhan Bhattacharya's 'রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1993

২২. Translation of Bhabatosh Datta's 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছন্দ' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1993

২৩. Translation of Rambahal Tiwari's 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছন্দ' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1993

২৪. Translation of Prakash Kumar Nandi's 'নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1993

২৫. Translation of Ajit Kumar Ghose's 'গোরা' from Bengali into Japanese, Tokyo, 1993

গ. *প্রকাশিত গ্রন্থ*

১. রবীন্দ্রনাথ-তাঁর চিন্তাধারা, টোকিও ১৯৮১ (in Japanese)

২. ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্জি। কাম্পো আরাই, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩

৩. উজ্জ্বল সূর্য, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৬

ঘ. *অনূদিত গ্রন্থ*

১. চলন্তিকা ব্যাকরণ (with Seizo Aoyagi) from Bengali to Jaspanese, Tokyo, 1964

২. ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) from Bengali to Japanese, Tokyo, 1967

৩. গোরা (রবীন্দ্রনাথ) from Bengali to Japanese, Tokyo, 1982

৪. রবীন্দ্র-চিত্রকলা : রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা (সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) with Naoki Nishioka and Masayuki Usuda from Bengali to Japanese, Tokyo, 1988

৫. শেকড়ের সন্ধানে (এম.এইচ. কবীর) from Bengali to Japanese, Tokyo 1995

৬. Les literatures de l'Inde (The Literature of India) by Louis Renou; from French to Japanese, Tokyo, 1996

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

১. 'হোরিসানের দিনপঞ্জি', in Bengali বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিতব্য

২. 'ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক বিনিময় ও রবীন্দ্রনাথ' in Bengali

৩. 'শিতকু হোরি ও রবীন্দ্রনাথ' in Bengali

৪. 'রবীন্দ্রনাথ ও সিনজো তাকাগাকি' in Bengali

৫. 'রবীন্দ্রনাথ ও জাপান— রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে' in Bengali

অধ্যাপক কাজুও আজুমা মহাশয়কে
৬৫তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে
শ্রদ্ধাবনত সম্মাননা

আপনি জাপানের বিশিষ্ট লেখক এবং খ্যাতিমান অধ্যাপক। আমাদেরও পরম প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয় কাছের মানুষ। আপনার প্রজ্ঞা, পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত করে। আমাদের ভূমি, নিসর্গ, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আপনাকে যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, এ আপনারই উদার গ্রহণ ক্ষমতার এক সমাদরণীয় উদাহরণ।

বাংলা ভাষার মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথকে জাপানের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহে ১৯৬৭-র এক শীতের দুপুরে আপনি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানিচর্চা বিভাগের অধ্যাপক-পদ অলংকৃত করেছেন তখন থেকে ১৯৭১ অবধি। ছেলেবেলার দিনগুলিতে যে রবীন্দ্রনাথ আপনাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিলেন, সেই দূরপ্রসারী অন্তঃসঞ্চারী কবিকে পরিণত মননশীলতায় আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করলেন। প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ সাহচর্যে আপনার অনুবাদের কাজ এগিয়ে চলল। বাংলা সাহিত্য ধন্য হল আপনার ধ্যাননিমগ্ন জ্ঞানতপস্যায়।

আপনি বহুভাষাবিদ, ভারতীয় দর্শনের নিবিষ্ট পাঠক এবং বাংলা বিদ্যাপথিক। আজও আপনার প্রতিটি দিন রবীন্দ্রনাথ ও জাপানবিষয়ক গবেষণায় নিবেদিত। আপনার প্রসন্ন রসবোধ, স্বচ্ছ চিন্তা, পরিশীলিত মনন, আপনার প্রকাশ, লাবণ্যময় অথচ নিয়ন্ত্রিত ভাষা আজ কিংবদন্তীতে পরিণত। আমরা আপনার বৌদ্ধিক সত্তাকে অভিবাদন করি।

জাপান ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের আপনি অগ্রদূত। আপনার সৃজনশীল মন বিশ্বের প্রেক্ষিত ধারণ করে আছে। এক মনস্বী জীবনশিল্পী আপনি সমস্ত ভেদরেখাকে অতিক্রম করেছেন আপনার প্রগাঢ় সাহিত্যবোধে। সমকাল ও আগামীকাল আপনার কাছে ঋণী। আপনার সমুজ্জ্বল উপস্থিতিতে আমরা মুগ্ধ। কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাকে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১৪ আগষ্ট ১৯৯৬
২৯ শ্রাবণ ১৪০৩
কৃপাশরণ হল
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা
কলকাতা

সমস্ত বাঙালিদের পক্ষে
ধর্মপাল মহাথের

অভিভাষণ

কাজুও আজুমা

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা আয়োজিত আমার এই জন্মোৎসবে আমি একদিকে যেমন ঈষৎ কুণ্ঠা অনুভব করছি, অন্যদিকে তেমনি গভীর আনন্দ এবং তৃপ্তিতে আমার মন ভরে উঠেছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়ছে :

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

আমার অনুভবে আমার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ। তিনি দূরকে নিকট এবং পরকে ভাই করেছেন। যার ফলে আজ আমি আমার জন্মদিনে এখানে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি।

ছোট বেলায় আমি প্রকৃতিকে ভালোবেসেছি। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধল, তখন ভীষণ মানসিক আঘাত পেয়েছি। তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হল, তাঁর অসামান্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অশান্তি দূর হল এবং এক অসাধারণ আনন্দের সন্ধান পেলাম। জগৎ এবং জীবনকে, মানুষকে দেখার নতুন দৃষ্টি পেলাম। সেই রবীন্দ্রনাথই আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এই মিলনের মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি।

যাঁর উৎসাহে আজকের এই উৎসবের আয়োজন শ্রদ্ধেয় ভন্তেজি ধর্মপাল মহাথের, তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ১৯৬৮ সাল থেকে। এই ধর্মাঙ্কুর সভা নানা জাতি ধর্ম ভাষা ও রাষ্ট্রের মানুষের মিলন-স্থল।

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইসাধন বসু-র প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তিনি ১৯৮৮ সালে জাপানে ভারত উৎসব ও বিভিন্ন রবীন্দ্র-অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে নিমাইসাধন বসু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রি ও রবীন্দ্র অনুরাগীদের কাছে নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতার আহ্বান জানান। ফলে ১৯৯৪ সালে নিপ্পন ভবন বাস্তবে রূপ নেয়।

অধ্যাপক দিলীপকুমার সিংহ, বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসাবে সম্প্রতি আমন্ত্রিত হয়ে জাপানে রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত নানা স্থান পরিদর্শন করে এসেছেন এবং বিভিন্ন গুণিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। জাপানবাসীর মনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা আজও যে কী গভীর তা তিনি প্রত্যক্ষ করে এলেন। জাপানবাসী তাঁকেও পরম শ্রদ্ধায় অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, বিশ্বভারতীতে যে নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উন্নতি কল্পে তিনি যথার্থ উদ্যোগী। এই ভবন প্রতিষ্ঠায় যাঁরা বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা

হলেন বিশ্বভারতীর প্রক্তন উপাচার্য নিমাইসাধন বসু, অশীন দাশগুপ্ত, শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী ভট্টাচার্য। এছাড়া অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মপাল মহাথের, অচিন্ত্যকুমার সাহা-ও প্রভূত সহযোগিতা করেছেন।

আজকের যিনি সভাপতি অধ্যাপক সোমেন-দা সান, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ দীর্ঘতর, ১৯৬৭ সাল থেকে। স্ত্রী-কন্যাসহ আমরা শান্তিনিকেতনে একদা তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে ছিলাম। তারপর বারবার কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে এবং জাপানে পুনর্মিলিত হয়েছি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্র গবেষণার ক্ষেত্রে নানা সময় নানা উপলক্ষে তাঁর আন্তরিক সহায়তা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে।

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জাপানে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে তাঁর অসামান্য বক্তৃতা এবং হৃদয়গ্রাহী কবিতা আবৃতিতে জাপানবাসী এবং প্রবাসী বাঙালি সাহিত্য-অনুরাগীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছেন। সে-সম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। আমরা সকলে তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম।

আজকের এই সভায় আপনারা যাঁরা অনুগ্রহ করে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।